১০৭তম জন্মদিবসে

কিংবদন্তীর সঙ্গে কিছুক্ষণ

মানুষ, একমাত্র মানুষই ইতিহাস রচনা করেন।
এটা ঠিকই যে মানুষ কখনো কখনো ভুলও করেন।
কিন্তু নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত
মানুষের জয়ই অবশ্যম্ভাবী।

জ্যোতি বসু

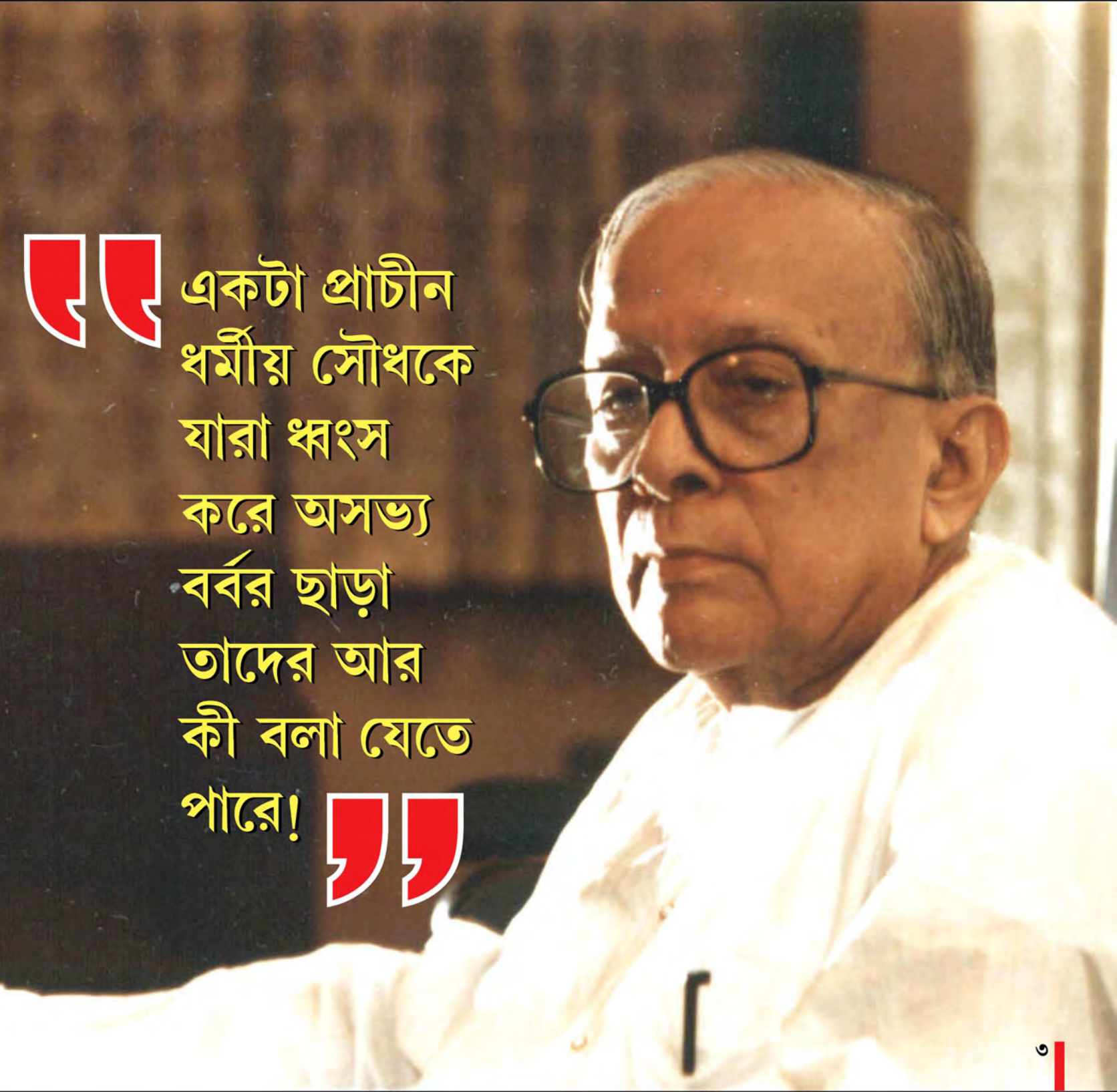
“একটা প্রাচীন ধর্মীয় সৌধকে যারা ধ্বংস করে অসভ্য বর্বর ছাড়া তাদের আর কী বলা যেতে পারে!”

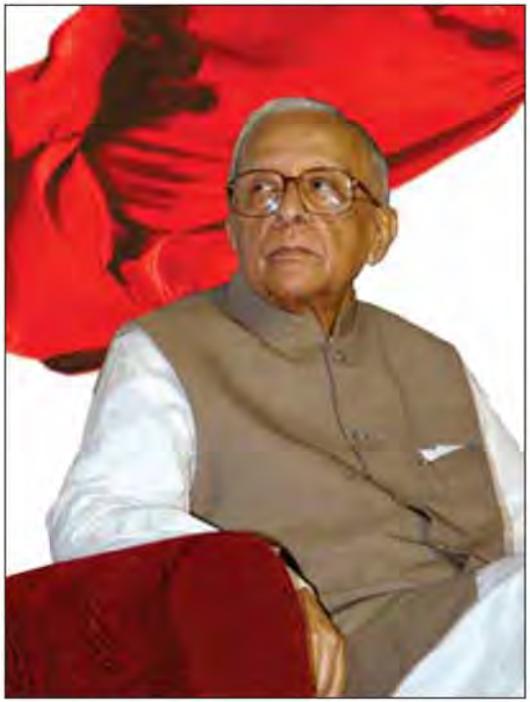

কিংবদন্তী জননেতা

জ্যোতি বসুর জন্ম ১৯১৪ সালের ৮ই জুলাই তখনকার কলকাতায় হ্যারিসন রোডের একটি বাড়িতে। মা হেমলতা দেবী, বাবা নিশিকান্ত বসু। আদি বাড়ি ঢাকা জেলার বারদি গ্রামে। নিশিকান্ত বসু ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে উচ্চতর শিক্ষালাভ করে তিনি কলকাতায় এসে প্র্যাকটিস শুরু করেন এবং তাঁর ভালই পসার হয়। এইসময়ে জ্যোতি বসুরা বেশ কিছুদিন কাটিয়েছেন ধর্মতলায় হিন্দুস্থান বিল্ডিং-এর ভাড়া বাড়িতে।

ছেলেবেলা

৬বছর বয়সে জ্যোতি বসুকে ভর্তি করা হয় লরেটো স্কুলে। পরে ভর্তি হন সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। ১৯২৪ সালে নিশিকান্ত বসু হিন্দুস্থান পার্কে নিজে বাড়ি তৈরি করে সেখানে সপরিবারে বসবাস শুরু করেন। সেন্ট জেভিয়ার্স থেকেই জ্যোতি বসু সিনিয়র কেমব্রিজ ও ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। পরে ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন।

জ্যোতি বসু নিজেই লিখেছেন, তাঁদের পরিবারে রাজনৈতিক চর্চার পরিবেশ ছিল না–তবে তৎকালীন বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি তাঁদের সহানুভূতি ছিল। বসু তাঁর মায়ের মুখে শুনেছিলেন, ১৯১৩সালে অনুশীলন সমিতির সদস্য বিপ্লবী মদনমোহন ভৌমিক তাঁদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বাড়িতে পুলিস এলে জ্যোতি বসু-র মা কাপড়ের আড়ালে আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিলেন। নিশিকান্ত বসু রাজনৈতিক প্রশ্নে নীরবই থাকতেন কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি তাঁর অটল সমর্থন ছিল। এসবই জ্যোতি বসুর মনে প্রভাব ফেলেছিল। তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়াকালীন ১৯৩০সালে চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। ঐ বিদ্রোহের বিরোধিতা করে স্কুলে লিফলেট বিতরণ করা হয়। জ্যোতি বসু তার প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, বিপ্লবীরা তো দেশের স্বার্থেই বিদ্রোহ করেছেন। তাহলে তাঁরা অন্যায়টা কী করেছেন? পুলিসী আক্রমণে

বিপ্লবীদের মৃত্যুর খবরে তাঁর মন খারাপ হয় এবং সেদিন ইস্কুলে যাননি। বাবাও কোনো আপত্তি করেননি।

বিলেতে মার্কসবাদে আকৃষ্ট

১৯৩৫ সালে জ্যোতি বসু ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত যান। তখন গোটা ইউরোপ অশান্ত। ইতালিতে ফ্যাসিস্ত মুসোলিনির উত্থান হয়েছে, তারা আবিসিনিয়া দখল করেছে। জার্মানিতে ক্ষমতায় এসেছে হিটলার। ফ্যাসিবাদের মোকাবিলায় সোভিয়েত ইউনিয়ন তার অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে জোরকদমে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। জাপান চীন আক্রমণ করেছে। তখন ইংল্যান্ডের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে চলছে রাজনীতি বিষয়ক তুমুল তর্কবিতর্ক। হ্যারল্ড ল্যাস্কি তাঁর ফ্যাসিবিরোধী ভাষণ দিচ্ছেন। এই পরিবেশে ছাত্র জ্যোতি বসু নিজেও ফ্যাসিবিরোধী পড়াশোনায় মনোনিবেশ করলেন। ভি কে কৃষ্ণমেননের নেতৃত্বে ভারতীয় ছাত্ররা তৈরি করলেন ইন্ডিয়া লিগ। জ্যোতি বসু তাঁদের অন্যতম। এই সময়ে ব্যারিস্টারি পড়তে এলেন ভূপেশ গুপ্ত, স্নেহাংশুকান্ত আচার্য্য চৌধুরী – যাঁদের সঙ্গে জ্যোতি বসুর গভীর বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছিল। এই সময়ে স্নেহাংশু আচার্য্যের দৌলতে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় কমিউনিস্ট পার্টি অব গ্রেট ব্রিটেনের (সি পি জি বি) নেতা হ্যারি পলিট, রজনীপাম দত্ত, বেন ব্র্যাডলির সঙ্গে। তাঁরা ইন্ডিয়া লিগকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে জনমত গঠনই ছিল ইন্ডিয়া লিগের কার্যক্রম। তখন লন্ডন, কেমব্রিজ, অক্সফোর্ডে তৈরি হয় কমিউনিস্ট গ্রুপ। সেই সময়ে প্রকাশ্যে কমিউনিস্ট পার্টি করা যেত না, কারণ ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। জ্যোতি বসুরা বিভিন্ন মার্কসবাদী পাঠচক্রে যোগ দিতেন। তাঁদের ক্লাস নিতেন হ্যারি পলিট, রজনীপাম দত্ত, ক্লিমেন্স দত্ত, বেন ব্র্যাডলি প্রমুখ। স্পেনে ফ্রাঙ্কোর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। দুনিয়ার প্রগতিশীল লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবী এতে অংশ নেন। এইসব ঘটনা তরুণ জ্যোতি বসুর মনকে আলোড়িত করে। এই সময়ে গঠিত হয় লন্ডন মজলিস। জ্যোতি বসু হন তার প্রথম সম্পাদক। রজনী প্যাটেল, পি এন হাকসার, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, ইউসুফ মেহের আলি খান প্রমুখ এতে যোগ দেন। নেহরু লন্ডনে এলে জ্যোতি বসুরা তাঁকে সংবর্ধনা দেন। নেহরুকে তাঁরা বলেন, আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। তখনই মনস্থির করেন দেশে ফিরে কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে কাজ করবেন। এসময়ে গ্রেট ব্রিটেন কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে তাঁরা নিরক্ষর ভারতীয় নাবিকদের মধ্যে সাক্ষরতা প্রসারের কাজও করেন। হ্যাম্পস্টেড হিথে ফ্যাসিস্তদের এক জনসভায় প্রতিবাদ করেন জ্যোতি বসু। কারণ ঐ সভার বক্তারা ভারত তথা ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বদনাম করছিলেন।

দেশে ফিরে সর্বক্ষণের কর্মী

১৯৪০ সালে ব্যারিস্টারি পরীক্ষা শেষ করে জ্যোতি বসু দেশে ফেরেন। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের নজর এড়িয়ে তিনি বেশ কিছু কমিউনিস্ট বইপত্র ভারতে নিয়ে আসেন। তিনি এবং ভূপেশ গুপ্ত, মোহনকুমার মঙ্গলম ও অরুণ বসু মহারাষ্ট্রে কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে যোগাযোগ করেন। কলকাতায় এসে হাইকোর্টে নাম লেখান জ্যোতি বসু, কিন্তু সেই থেকে কোনো দিনই প্র্যাকটিস করেননি। কারণ তখনই মনস্থির করে ফেলেছেন কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হবেন।

এই সময়ে বিশ্বযুদ্ধের চরিত্র পরিবর্তন হয়। হিটলার সোভিয়েত

ইউনিয়ন আক্রমণ করলে বিশ্বযুদ্ধ জনযুদ্ধের চরিত্র গ্রহণ করে। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় সোভিয়েত সুহৃদ সঙ্ঘ ও ফ্যাসিবিরোধী লেখক সঙ্ঘ। জ্যোতি বসু হন তার সম্পাদক। তাঁর প্রথম বিবাহ হয় ছবি ঘোষের সঙ্গে, যদিও বিয়ের অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাঁর স্ত্রী বিয়োগ ঘটে। মা হেমলতা দেবীর মৃত্যু হয় কিছুদিন পরেই।

কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে জ্যোতি বসুর কাজ ছিল আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট নেতাদের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করা। এরপর ১৯৪৪সালে কমিউনিস্ট পার্টি তাঁকে শ্রমিকদের সংগঠন গড়ার কাজ করতে বলে। বঙ্কিম মুখার্জি, সরোজ মুখার্জিসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তিনি শ্রমিক সংগঠনের কাজে ঘুরে বেড়াতে থাকেন যুক্তবঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশে। ১৯৪৪সালে জ্যোতি বসুদের তৎপরতায় গঠিত হয় বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। বসু হন তার প্রথম সম্পাদক। ১৯৪৫সালে কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

সে এক অগ্নিগর্ভ সময়। উত্তাল ১৯৪৬সাল। নৌ-বিদ্রোহ, ডাক ধর্মঘট, বন্দী মুক্তি আন্দোলন, রশিদ আলি দিবস সব মিলিয়ে উত্তপ্ত বাতাবরণ। এহেন পরিবেশে কমিউনিস্ট জ্যোতি বসু এলেন বিধানসভায়।

প্রশ্ন ছিল অনেকের মনে। মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের সন্তান। বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার। এমন তরুণ কি কমিউনিস্ট আন্দোলনে ধোপে টিকবে? কারণ, কমিউনিস্টদের রাস্তা ফুল বিছানো নয়। কিন্তু যে চারিত্রিক দৃঢ়তা থাকলে কমিউনিস্ট নেতা হওয়া যায় জ্যোতি বসুর মধ্যে তা মানুষ প্রত্যক্ষ করলেন অচিরেই।

বিধানসভায়

১৯৪৬ সালে রেলওয়ে শ্রমিক কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হুমায়ুন কবীরকে পরাস্ত করে জ্যোতি বসু অবিভক্ত বঙ্গীয় বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। সে বছর আরও দুই কমিউনিস্ট প্রার্থী বিধানসভার সদস্য হয়েছিলেন। দার্জিলিঙ কেন্দ্রে রতনলাল ব্রাহ্মণ ও দিনাজপুর কেন্দ্রে রূপনারায়ণ রায়। সুরাবর্দির নেতৃত্বে বঙ্গদেশে মুসলিম লিগ সরকার গঠন করল।

সে বছরের ২৫শে জুলাই জ্যোতি বসু বিধানসভায় প্রথম বক্তৃতা দিলেন। বিষয় বাংলার খাদ্য সঙ্কট। সেই প্রথম ভাষণই বহুজনের নজর কেড়েছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা ও অন্যান্য পত্রিকায় তা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছিল। সেই শুরু।

তারপর কত না ঘটনা। বন্দীমুক্তির দাবিতে সরব সাধারণ মানুষ। বিধানসভার ভিতরে তাঁদের দাবিকে উপস্থিত করছেন কমিউনিস্ট সদস্যরা। ২৯শে জুলাইয়ের ডাক ধর্মঘটে অচল সারা বাংলাদেশ। অচল বিধানসভাও। কুখ্যাত ডেপুটি পুলিস কমিশনার সামসুদ্দোহা গ্রেপ্তার করলেন জ্যোতি বসুকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বসুর কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হলেন। জ্যোতি বসু, রূপনারায়ণ রায়, রতনলাল ব্রাহ্মণরা বিধানসভায় তুলছেন জমিদারী প্রথা বিলোপের দাবি, চটকল জাতীয়করণের দাবি, কৃষকদের বিনামূল্যে জমি বিতরণের দাবি। প্রতিটি বিষয়েই নতুন কথা যা আগে কেউ কখনও শোনেনি। প্রতিটি বিষয়ে বিকল্প বক্তব্য। জ্যোতি বসু উপস্থিত করছেন গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী। বিরোধিতার নামে এখনকার মতো শুধু অহেতুক হইচই বিশৃঙ্খলা নয়। সুনির্দিষ্ট বক্তব্যে জেরবার হচ্ছে সরকারপক্ষ। সরকারী আসনে বসে বর্ধমানের মহারাজা উদয়চাঁদ মহতাবদের মতো ধনাঢ্যরা। তাঁদের শ্রেণীচরিত্র উন্মোচনেও তীক্ষ্ণ জ্যোতি বসু।

নৌ-বিদ্রোহীদের সমর্থনে জ্যোতি বসু, মহম্মদ ইসমাইলদের নেতৃত্বে বি এ রেলওয়েতে ২৪ ঘণ্টার ধর্মঘট হচ্ছে। দাঙ্গা-বিধ্বস্ত কলকাতায় নারকেলডাঙা শ্রমিক লাইনেও উপস্থিত তিনি। মহম্মদ ইসমাইলের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ছেন দাঙ্গায় আটকে পড়া সহযোদ্ধাদের উদ্ধার করতে। ১৯৪৭সালে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিধানসভায় বসু যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা কি আজও প্রাসঙ্গিক নয়? আবার সেই বছরই তিনি বেরিয়ে পড়ছেন তেভাগা সংগ্রামীদের উপর দমন-পীড়নের

রিপোর্ট নিতে উত্তরবঙ্গে। ছুটে যাচ্ছেন স্নেহাংশু আচার্য্যের সঙ্গে ময়মনসিংহে হাজং যোদ্ধাদের পাশে। ময়মনসিং থেকে জ্যোতি বসুকে বহিষ্কার করলো পুলিস প্রশাসন। তেভাগা থেকে স্লোগান উঠেছে 'জান দেব, তবু ধান দেব না।' বিধানসভার ভিতরে জ্যোতি বসু বলছেন 'সামিরুদ্দিন ও শিবরামের আত্মদান ব্যর্থ হবে না।'

স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসী নিপীড়ণের বিরুদ্ধে

স্বাধীন দেশে বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিনেই জনসাধারণের উপর কংগ্রেসী সরকারের পুলিসী লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস। বিধানসভায় প্রফুল্ল ঘোষের কালাকানুনের বিরোধিতা করছেন জ্যোতি বসু। তাঁর দৃপ্ত ঘোষণা, 'সর্বশক্তি দিয়ে এ কালাকানুন আমরা প্রতিরোধ করব।'

আবার এই পরিস্থিতিতেই কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হলো। বিনাবিচারে গ্রেপ্তার হলেন জ্যোতি বসু। মুক্তি পেলেন ৩ মাস পর। পার্টির পরামর্শে আত্মগোপন করছেন। ছদ্মবেশে এবং 'বকুল' ছদ্মনামে নেতৃত্বের নির্দেশ গোপনে পৌঁছে দিচ্ছেন। সহযোদ্ধাদের সঙ্গে রান্না করছেন, ঝাঁট দেওয়া, বাসন ধোওয়া ইত্যাদি। গেরস্থালির কাজ সামলাচ্ছেন, তেলেঙ্গানার সংগ্রামীদের মুক্তির দাবিতে ছুটে যাচ্ছেন জওহরলাল নেহরুর কাছে, বিধায়ক হিসাবে প্রাপ্য অর্থ তুলে দিচ্ছেন পার্টি তহবিলে এবং পার্টির ভাতায় সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কাজ করছেন শৃঙ্খলার সঙ্গে। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে জ্যোতি বসুর সঙ্গে বিবাহ হয় কমল বসুর। ১৯৫২ সালে তাঁর পুত্র চন্দন বসুর জন্ম হয়। ১৯৫১ সালে নবপর্যায়ে দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকা শুরু হলে জ্যোতি বসু হন সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি। ১৯৫২ সালের নির্বাচন পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন।

স্বাধীন ভারতে প্রথম নির্বাচনে ১৯৫২ সালে বরানগর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীকে পরাস্ত করে তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচিত হলেন। এই নির্বাচনে কমিউনিস্টদের আসন সংখ্যা বেড়ে হলো ২৮ জন। কিন্তু সেদিন বিধানসভায় অধ্যক্ষ হাস্যকর যুক্তি দেখিয়ে তাঁকে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি দেননি, তবে প্রধান বিরোধী দলের নেতা হিসাবে মেনে নেন। কংগ্রেসের অপশাসন সম্পর্কে বসুর তীক্ষ্ণ ভাষার প্রতিবাদ তখনও থেমে থাকেনি। ১৯৫৩ সালের ট্রামভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলনের সময় পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল। শিল্পে শান্তিরক্ষার নামে কালাকানুন আনার কঠোর বিরোধিতা করে জ্যোতি বসু সেদিন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কেও 'স্বেচ্ছাচারী' বলতে কসুর করেননি। বসু তাঁকে বলেছিলেন, 'আইনের শাসন কাকে বলে আপনি জানেন না।' আবার ১৯৫৪ সালে শিক্ষক আন্দোলনের উপর দমন-পীড়নের নিন্দায় জ্যোতি বসুর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেছে। পুলিসের গ্রেপ্তার এড়াতে সাতদিন আশ্রয় নিয়েছিলেন বিধানসভায়। আবার বিধানসভাতে বসেই শিক্ষকদের দাবি নিয়ে সরকারপক্ষের সঙ্গে মীমাংসা করিয়েছিলেন। কিন্তু সাতদিন পর বিধানসভা থেকে বেরোতেই পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করল। জেলে আটকে রাখল দু'দিন।

১৯৫৭ সালের নির্বাচনে বরানগরে কংগ্রেস প্রার্থী কানাইলাল ঢোলকে পরাস্ত করে তৃতীয়বারের জন্য নির্বাচিত হলেন জ্যোতি বসু। এই বিধানসভাতেই বসুকে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলেন অধ্যক্ষ। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে অসত্য প্রচারে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে পিছিয়ে আসেননি তিনি। উদ্বাস্তু সমস্যা, বস্তি সমস্যা সম্পর্কে বিরামহীনভাবে বলে যাচ্ছেন জ্যোতি বসু ও অন্যান্য কমিউনিস্ট বিধায়করা। ১৯৫৮ সালে জ্যোতি বসুই প্রথম কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের দাবিতে বিধানসভায় আলোচনা করেছিলেন। প্রস্তাব দিয়েছিলেন এই দাবিতে সকল দল মিলে কেন্দ্রের কাছে ডেপুটেশন দেবার। সেদিন তাঁর কিছু দাবির যৌক্তিকতা ডাঃ রায়ও স্বীকার করে নিয়েছিলেন। জ্যোতি বসুকেই দেখা গেছে খাদ্য আন্দোলনের সময় নৃশংস কংগ্রেস সরকারের বর্বরতার ও ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিতে। কায়েমীস্বার্থের চক্ষুশূল হয়েছিলেন বলেই ১৯৫৯ সালে কংগ্রেসী সমাজবিরোধীরা বরানগরে তাঁর উপর আক্রমণ করেছিল। গাড়ি ভাঙচুর হয়েছিল। সহকর্মীরা রক্তাক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের নিয়ে বসু গিয়েছিলেন হাসপাতালে। কিন্তু এ ঘটনায় কোনো মামলা হয়নি। কাউকে শাস্তি দেওয়া হয়নি।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে স্তালিনের ভাবমূর্তি

নষ্ট করার সুপরিকল্পিত চক্রান্ত শুরু হয়। এ অবস্থায় ১৯৬১সালে অবিভক্ত পার্টির তিন সদস্যের প্রতিনিধিদলে জ্যোতি বসু ছিলেন। তাঁরা সুশলভ ও পনোমারিয়েভের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বসু সোভিয়েত নেতাদের কাছে জানতে চান, স্তালিনের সময় আপনারাই নেতা ছিলেন। তখন সমালোচনা করেননি কেন?

একই সময়পর্বে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক নেতৃত্বও তাঁকে নিতে হয়েছে। ১৯৫৩-৫৪সালে ষষ্ঠ রাজ্য সম্মেলনে তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। টানা ১৯৬১সালের জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি ঐ পদে ছিলেন।

১৯৬২সালের নির্বাচনে জ্যোতি বসু চতুর্থবারের জন্য জিতে এলেন বরানগর কেন্দ্র থেকেই। এবার পরাজিত হলেন কংগ্রেসেরই ধীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। ১৯৬৩সালে বিধানসভার অভ্যন্তরে তাঁকে শুনতে হয়েছে 'চীনের দালাল' ও আরও কত না বিশেষণ। সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন জ্যোতি বসু। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ সম্পর্কে পার্টির বক্তব্যকে দৃঢ়তার সঙ্গে উপস্থিত করেছিলেন তিনি। তিনি বলেছিলেন শান্তিপূর্ণভাবেই দু'দেশের মধ্যে বিরোধ মিটিয়ে নিতে হবে। জ্যোতি বসু যে মাথা নোয়ানোর মানুষ নন, বরং প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেই যে তাঁকে আরও বেশি চেনা যায় সেদিন তা প্রমাণ হয়েছিল। তবু আনন্দবাজার লিখেছিল 'জ্যোতি বসুর অগস্ত্য যাত্রা'। বলাইবাহুল্য ইতিহাসের বিচারে সেদিনের এইসব কুৎসা আজ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে। এই সময়েই কংগ্রেস সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল আরও অনেক পার্টিনেতাদের সঙ্গে অথচ, সংঘর্ষ তখন থেমে গেছে। বসু আটক রইলেন এক বছরের জন্য। জেলে

থাকাকালীনই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়।

মতাদর্শগত সংগ্রামে

প্রবল মতাদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল সি পি আই (এম)। সেই লড়াইয়েরও অন্যতম নেতা, জ্যোতি বসু। ১৯৬১সালে অন্ধ্র প্রদেশের বিজয়ওয়াদায় অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির শেষ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। তখন থেকেই পার্টিতে মতাদর্শগত বিরোধ প্রকট হয়েছে। ডাঙ্গের নেতৃত্বাধীন সংশোধনবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে বত্রিশজন জাতীয় পরিষদ সদস্য ওয়াকআউট করেছিলেন জ্যোতি বসু তাঁদের মধ্যে ছিলেন। ১৯৬৪সালে অনুষ্ঠিত তেনালী কনভেনশনেরও অন্যতম শীর্ষ সংগঠক ছিলেন জ্যোতি বসু। ১৯৬৪ সালে কলকাতায় পার্টির সপ্তম কংগ্রেসের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন জ্যোতি বসু। এই কংগ্রেস থেকে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটি তথা পলিট ব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৫সালে সি পি আই (এম) কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র পিপলস ডেমোক্র্যাসি আত্মপ্রকাশ করলে জ্যোতি বসু হন তাঁর প্রথম সম্পাদক। ১৯৬৭সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে যে বাম হঠকারিতার বিরুদ্ধে লড়াই সংগঠিত হয়েছিল বসু ছিলেন তার সামনের সারিতে। আর তাই নকশালপন্থী অতিবিপ্লবীদের আক্রমণে ও ব্যক্তিগত কুৎসার অন্যতম লক্ষ্যবস্তু ছিলেন জ্যোতি বসু।

কংগ্রেসের অপশাসনে মানুষের ক্ষোভ তখন চরমসীমায়। ১৯৬৭সালে বরানগর কেন্দ্রে কংগ্রেসের অমরেন্দ্র ভট্টাচার্যকে হারিয়ে বসু নির্বাচিত হলেন পঞ্চমবারের জন্য। প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হলো প্রথম অকংগ্রেসী সরকার, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা। আসন সংখ্যার বিচারে সি পি আই (এম) দাবি করতে পারত মুখ্যমন্ত্রিত্বের। জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী হতে পারতেন। কিন্তু বাংলা কংগ্রেস বেঁকে বসলো। অজয় মুখার্জি মুখ্যমন্ত্রী হলেন। জনগণের স্বার্থে সি পি আই (এম) তা মেনে নিলো। জ্যোতি বসু তার উপমুখ্যমন্ত্রী। অস্থির রাজনীতি, দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনীতির পালাবদল। বিশ্বাসঘাতকদের জন্য ভেঙে গেল যুক্তফ্রন্ট। তবু ১৯৬৯সালে বরানগরে কংগ্রেসের অমরেন্দ্র ভট্টাচার্যকে পরাজিত করে জনগণ জ্যোতি বসুকেই জয়ী করলেন। ১৯৬৯সালে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আর একবার দেখলেন তাঁর দৃঢ়চিত্ততা। একদল মারমুখী পুলিসকর্মী বিধানসভায় জ্যোতি বসুর ঘরে ঢুকে তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের সামনে আত্মসমর্পণ করলেন।

জনগণের সমাবেশ বাড়ছে। বাড়ছে শত্রুও। তাই ১৯৭০ সালে পাটনা স্টেশনে আনন্দমার্গীরা তাঁকে হত্যার চেষ্টা করল। অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন। ধিক্কারে ফেটে পড়ল গোটা পশ্চিমবঙ্গ, গোটা দেশ। তখন পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। বারুইপুরে জনসভা করতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন জ্যোতি বসু ও জ্যোতির্ময় বসু। গাড়ি ভাঙচুর হলো। সভার আলো নিভিয়ে দেওয়া হলো। সভা পণ্ড হলো। জ্যোতি বসুর নির্দেশে পার্টিকর্মীরা প্ররোচনায় পা দিলেন না। এই ঘটনাতেও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। পরে এক শিক্ষক প্রতিনিধি দলকে সিদ্ধার্থশঙ্কর বলেছিলেন, ওটা এমন কিছু ব্যাপার না। জ্যোতি বসুর গাড়িতে ২ জন চাপা পড়েছিলো বলেই ঐ কাণ্ড ঘটেছে।

আবার আক্রান্ত হলেন জ্যোতি বসু। বসিরহাটে জনসভা করতে গিয়ে। সঙ্গে ছিলেন আবদুল্লাহ রসুল ও অন্যান্যরা। গাড়ি লক্ষ্য করে বোমা মারা হয়। দু'টি বোমা গাড়ির ইঞ্জিনে লেগে গাড়িটি ভীষণরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৯৭১সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে শ্যামপুকুরে খুন হলেন শ্রদ্ধেয় জননেতা হেমন্ত বসু। উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরেই সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এ ঘটনার দায় চাপালেন সি পি আই (এম)-র ঘাড়ে। ফলে শহরের কিছু মানুষ মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হলেন। তবু ঐ নির্বাচনে সি পি আই (এম) একক বৃহত্তম দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলো। জ্যোতি বসু জিতলেন বরানগরেই। পরাজিত প্রার্থী অজয় মুখার্জি। কিন্তু সর্বাধিক আসন পাওয়া সত্ত্বেও সি পি আই (এম)-কে সরকার গঠনের জন্য ডাকলেন না রাজ্যপাল।

কার্যত পশ্চিমবঙ্গে জরুরী অবস্থা শুরু হয়ে গিয়েছিলো ১৯৭২ সাল থেকেই।

জনগণের জয়যাত্রাকে পথ আটকাতেই ১৯৭২ সালে কংগ্রেস বেছে নিলো রিগিংয়ের রাস্তা। সেদিন নির্বাচনের নামে পুরোপুরি প্রহসন হয়েছিলো। বরানগরে গিয়ে জ্যোতি বসু স্বচক্ষে দেখলেন তাদের কুকীর্তি। বেলা বারোটার মধ্যেই বসু ঐ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি সিদ্ধার্থ রায়ের বিধানসভাকে 'জোচ্চোরদের বিধানসভা' বলে অভিহিত করেছিলেন। শাসকদলের পক্ষে সাহস হয়নি তাঁর বিরুদ্ধে বিধানসভায় স্বাধিকারভঙ্গের প্রস্তাব আনার।

পশ্চিমবঙ্গের একাত্তর থেকে সাতাত্তরে আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের ও জরুরী অবস্থার দিনগুলিতে জনগণ জ্যোতি বসুকে পেয়েছেন তাঁদের পাশে এবং সামনে। বহু নেতা, শতশত কর্মীর রক্ত ঢালা পিচ্ছিল

পথে তাঁকে এগোতে হয়েছে। এগিয়েছেন রাজ্যের জনগণও।

বামফ্রন্ট সরকার গঠন

গণ-আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষেই ১৯৭৭সালে বামফ্রন্ট সরকারের আবির্ভাব। সাতগাছিয়া কেন্দ্রে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে বিধানসভায় ফিরে এলেন জ্যোতি বসু। এবার তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। সেদিন প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁকে প্রথম প্রশ্নই ছিলো, আপনি কি মনে করেন আপনার সরকার স্থায়ী হবে? জ্যোতি বসু বলেছিলেন, আমাদের বিশ্বাস আছে স্থায়ী হবে। কারণ অনেক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে বামফ্রন্ট।

১৯৭৭সালে জ্যোতি বসু যখন পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হন তখন তাঁর বয়স ৬৩ বছর। সাধারণত এই বয়সে মানুষ অবসর নেন। কিন্তু জ্যোতি বসুর ক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হলো।

মুখ্যমন্ত্রী হয়েই বসু ঘোষণা করলেন, আমরা কেবলমাত্র রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে সরকার পরিচালনা করবো না। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। জনসাধারণ ও বিভিন্ন গণসংগঠনের পরামর্শ নিয়েও এই সরকার চলবে।

জ্যোতি বসু মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই সিদ্ধান্ত করেন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার। নকশালপন্থীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ১৭০০০রাজনৈতিক বন্দীকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হয়। ১০,০০০মামলা প্রত্যাহার করা হয়। রাজনৈতিক কারণে কর্মচ্যুত প্রত্যেক সরকারী কর্মচারীর চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বস্তুত তাঁর

নেতৃত্বে প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের সিদ্ধান্তগুলির ফলাফল ছিলো সুদূরপ্রসারী।

অগ্রাধিকার পেয়েছিলো ভূমি সংস্কারের কাজ। চালু হয় অপারেশন বর্গা। ফিরিয়ে দেওয়া হয় শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার। বসু ঘোষণা করেন, শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে পুলিসী হস্তক্ষেপ ঘটবে না। তাঁরই মন্ত্রিসভা নিয়মিত পঞ্চায়েত ও পৌরসভা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত হয় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন।

বস্তুত বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার দিন থেকে বিশেষত এরাজ্যের বিরোধীপক্ষ সরকারের সঙ্গে শুধু অসহযোগিতাই নয়, পদে পদে তার কাজে বাধা সৃষ্টি করে এসেছে। কিন্তু সেই বাধা ঠেলে, ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে বামফ্রন্ট সরকার তার ২১দফা কর্মসূচী রূপায়িত করেছে, যার নেতৃত্বে ছিলেন জ্যোতি বসু। ১৯৭৮সালেই পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা হয়। এই বন্যার মোকাবিলায় আশ্চর্য সাফল্য দেখিয়েছিলো বামফ্রন্ট সরকার। এক বিরাট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলো সেদিনের নবগঠিত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত। কোনও মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে আসেননি। এই সময়েই বিনোবা ভাবে হঠাৎই পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালায় গো-হত্যা বন্ধের জন্য অনশন শুরু করেন। এর ফলে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরির আশঙ্কা ছিলো। বসুর চেষ্টায় ও প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের হস্তক্ষেপে বিনোবা ভাবে অনশন প্রত্যাহার করেন।

১৯৮০সালে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস পুনরায় দিল্লিতে ক্ষমতায় ফেরে। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের লম্ফঝম্ফ শুরু হয়। সেদিন জ্যোতি বসু বলেছিলেন, এই জয় গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা বিপন্ন এই অজুহাতে কলকাতার রাস্তায় মারমুখী হয়ে ওঠে কংগ্রেস। ১৯৮১ সালের ৩রা এপ্রিল কংগ্রেসী দুষ্কৃতীদের ছোঁড়া পেট্রোল বোমার আক্রমণে ১৫ জন নিরীহ বাসযাত্রী মারা যান। প্রতিবাদের ঝড় ওঠে পশ্চিমবঙ্গে। প্রতিবাদের সামনের সারিতে ছিলেন জ্যোতি বসু। সেই সময় খবরের কাগজগুলি নিয়মিত খবর ছেপেছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার যেকোন মুহূর্তে বামফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দেবে। কিন্তু তাদের সে সাহস শেষ পর্যন্ত হয়নি।

ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় ফিরে নতুন করে এসমা, নাসা প্রভৃতি কালা কানুন লাগু করেন, যদিও জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার তা পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর করেনি।

মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে জ্যোতি বসুর বিরাট ভূমিকা ছিলো কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের প্রশ্নটি সর্বভারতীয় রাজনীতির অঙ্গনে তুলে নিয়ে আসা। বৃহৎ শিল্প স্থাপনে কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রথা, মাসুল সমীকরণ নীতি, রাজ্যগুলির আর্থিক সামর্থ্যকে শুকিয়ে মারার চক্রান্তের বিরুদ্ধে বসু ছিলেন সরব। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮৩সালে সারকারিয়া কমিশন গঠন করতে বাধ্য হয়। এই সময়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অকংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জ্যোতি বসু। যদিও এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অবিচার চরম আকার নেয়। সীমান্তবর্তী

রাজ্য এই অজুহাতে ইন্দিরা গান্ধী বিধাননগরে ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স করার অনুমতি দেননি। অবিচার চলতে থাকে হলদিয়া পেট্রোকেম ও বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণেও। সেদিন জ্যোতি বসুর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিলো, বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প আমরা তৈরি করবোই। এ হলো পশ্চিমবঙ্গের আত্মমর্যাদার প্রতীক। সেদিন তাঁর আহ্বানে সারা দিয়ে হাজার হাজার যুবক-যুবতী বক্রেশ্বর প্রকল্পে রক্তদান করেছিলো। বহু মানুষ তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণে অর্থ সাহায্য করেছিলেন, স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েছিলেন। এই নিয়ে কিছু সংবাদপত্র ব্যঙ্গ করলেও বক্রেশ্বর প্রকল্প নির্মাণের কাজ শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে। জ্যোতি বসুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মানুষ পদযাত্রা করেছেন হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস প্রকল্প নির্মাণের জন্য। ১৯৮৫সালেই বামফ্রন্ট সরকার যৌথ উদ্যোগে বৃহৎ শিল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। অবশেষে হলদিয়া প্রকল্পও রূপায়িত হয় কেন্দ্রের সহযোগিতা ছাড়াই।

১৯৮৬সালে দার্জিলিঙ জেলায় গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন বিচ্ছিন্নতাবাদী রূপ নেয়। তাদের হিংসাত্মক আন্দোলনে দার্জিলিঙ অশান্ত হয়ে ওঠে। এই সময়ে জ্যোতি বসুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় রাজ্যভাগ প্রতিহত করা যায় এবং গঠিত হয় দার্জিলিঙ গোর্খা পার্বত্য পরিষদ।

কেন্দ্রীয় অবিচারের বিরুদ্ধে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ যখন সরব, তখন ১৯৮৭'র বিধানসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী কংগ্রেসের হয়ে প্রচারে এলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন ১০০৭কোটি টাকার সাহায্য প্রকল্পের। সেদিন জ্যোতি বসু এই অবাস্তব প্রতিশ্রুতির ফানুস চুপসে দিয়ে বলেছিলেন, টাকার থলি দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে কেনা যাবে না। সেই নির্বাচনের ফলাফলেই তা প্রমাণিত হয়েছিলো।

এই প্রসঙ্গে বলতে হয় ১৯৮৪সালে দেহরক্ষীর গুলিতে ইন্দিরা গান্ধী নিহত হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গেও দাঙ্গা বাধানোর ষড়যন্ত্র হয়েছিলো। সেদিন জ্যোতি বসুর নির্দেশে প্রশাসন দ্রুত হস্তক্ষেপ করে। পশ্চিমবঙ্গে যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ অটুট থাকে সে বিষয়ে বসু ছিলেন সদা সতর্ক। বিশেষ করে জাতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক বি জে পি'র উত্থান তাঁকে উদ্বিগ্ন করেছিলো। বাবরি মসজিদ ভাঙার পর তিনিই বলতে পেরেছিলেন, এ হলো অসভ্যতা ও বর্বরতা। তিনবিঘা চুক্তি সম্পাদন ও ফরাক্কা জল চুক্তির বিষয়ে জ্যোতি বসুর ভূমিকা ছিলো বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

শুধু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রিত্ব দিয়ে বিচার করলে জ্যোতি বসুর রাজনৈতিক জীবনকে ধরা যাবে না। তিনি প্রকৃত অর্থেই ছিলেন এক সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট নেতা। এই দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি ভারতবর্ষের এমন কোনো প্রান্ত নেই যেখানে যাননি। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক বাঁক ও মোড়ে তাঁর বিচক্ষণ হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়েছে বারে বারে। বিরোধীদের কাছ থেকে সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছেন নিজ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে। প্রচারের জন্য তিনি কোনদিনই লালায়িত ছিলেন না। বরং প্রচারমাধ্যমই তাঁকে অনুসরণ করেছে। দুঁদে সাংবাদিকরাও তাঁকে প্রশ্ন করে বেকায়দায় ফেলতে পারতেন না। সব সময়ে মাথা উঁচু রেখেই প্রত্যুত্তর করতেন। যে কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতিতেই জ্যোতি বসুকে স্বমূর্তিতে পাওয়া যেত। ১৯৯৬সালে কেন্দ্রে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলে যুক্তফ্রন্টের পক্ষ থেকে তাঁকেই প্রধানমন্ত্রী করার প্রস্তাব এসেছিলো। কিন্তু সি পি আই (এম) যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নেয়।

সারা জীবনে গ্রেট ব্রিটেন ছাড়াও সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা, ইজরায়েল, হল্যান্ড, জার্মানি, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ডসহ বহু দেশে ভ্রমণ করেছেন। পৃথিবীর বহু নামজাদা রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন তিনি। বহির্বিশ্বে ভারতের কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে তাঁর থেকে বেশি পরিচিতি আর কারোরই হয়নি।

মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে অবসর

২০০০সালের নভেম্বরে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে অবসর নেন। তখনই তিনি বলেছিলেন, আমি মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে অবসর নিচ্ছি–তবে রাজনীতি থেকে নয়। কমিউনিস্টরা অবসর নেয় না। যতদিন শরীর অনুমতি দেবে ততদিন মানুষের মুক্তির সংগ্রামে কাজ করে যাবো। ২০০৩সালে তাঁর স্ত্রী কমল বসু প্রয়াত হন।

২০০৪সালে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার গঠিত হয় বামপন্থীদের বাইরে থেকে সমর্থনের ভিত্তিতে। এই সরকার গঠনের ক্ষেত্রে জ্যোতি বসু ও হরকিষেণ সিং সুরজিতের বিশেষ ভূমিকা ছিলো। ২০০৫সালে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত সি পি আই (এম)-র অষ্টাদশ কংগ্রেসে জ্যোতি বসু পলিট ব্যুরোয় পুনর্নির্বাচিত হন, যদিও তিনি নিজে শারীরিক কারণেই পলিট ব্যুরো থেকে অব্যাহতি চেয়েছিলেন। ২০০৬সালের বিধানসভা নির্বাচনেও তিনি প্রচারাভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। ২০০৮সালে কোয়েম্বাটোরে অনুষ্ঠিত সি পি আই (এম) ঊনবিংশ কংগ্রেসে বসু পলিট ব্যুরোর স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর থেকে বসুর শরীর ক্রমশই খারাপ হতে থাকে। অনেকদিনই কানে কম শুনছিলেন। দৃষ্টিশক্তিও কমে আসছিলো। শরীরের অন্যান্য কষ্ট তো ছিলোই। তবু মস্তিষ্ক ছিলো সজাগ। ২০০৯ সালে ইন্দিরা ভবনের বাইরে বেরনোর মতো অবস্থা থাকলো না। তবু সেখানে বসেই পার্টির তথা সরকার পরিচালনার বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া, নানা ধরনের আনুষ্ঠানিক কর্মসূচীতে তিনি অংশ নিয়েছেন।

সারা জীবনে জ্যোতি বসু অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'যত দূর মনে পড়ে'।

সেই অর্থে জ্যোতি বসু বাগ্মী ছিলেন না। কিন্তু সহজ-সরল ভাষায় মানুষের মনকে ছুঁতে পারতেন তিনি। জনগণের কাছে পরিস্থিতির খোলামেলা বিশ্লেষণ করতেন। বিপুল রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ জ্যোতি বসুর রাজনৈতিক বিশ্লেষণী ক্ষমতাও ছিলো অসাধারণ। তিনি বারে বারে বলতেন, যে কাজ করতে পেরেছি তা যেমন মানুষকে বলতে হবে–যা পারিনি তা কেন পারিনি মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করতে হবে। তাঁর ভাষণ শোনা ছিলো এক রাজনৈতিক শিক্ষা। জনসাধারণের সঙ্গে ভালো

ব্যবহার করা, তাঁদের সঙ্গে মিশে থাকার পরামর্শ দিতেন কমিউনিস্ট কর্মীদের। প্রবল ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি স্নেহপ্রবণ অমায়িক মানুষ ছিলেন বসু। যিনিই তাঁর সঙ্গে সামনাসামনি সাক্ষাৎ করেছেন তাঁরই এক অভিজ্ঞতা। মানুষকে সম্মান দিতে জানতেন, তাই পেয়েছেনও সম্মান। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন তো বটেই–কৃষক, কর্মচারী, শিক্ষক, ছাত্র, যুব, মহিলা সহ বিভিন্ন আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি বিরামহীনভাবে ছুটে গেছেন দেশের নানা প্রান্তে। পশ্চিমবঙ্গের এমন কোন এলাকা ছিলো না যেখানে বসু যাননি। তাঁর দৃপ্ত হাঁটাচলা, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব মানুষের মুখে মুখে ফিরতো। বারে বারে ইতিহাসের বহু বাঁক ও মোড়ে সঙ্কটের সময়ে দুর্দমনীয় সাহস ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন জ্যোতি বসু। সংসদীয় এবং সংসদ-বর্হিভূত এই উভয় ধরনের আন্দোলনকে যুগপৎ নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। জ্যোতি বসুর জীবন-ইতিহাস এক সাহসের ইতিহাস। সারাজীবন জনগণের জন্য, জনগণের মুক্তির জন্য, জনগণের সঙ্গে তাঁদের নেতৃত্ব দিয়েছেন জননেতা জ্যোতি বসু। তাই যেখানেই জ্যোতি বসু, সেখানেই জনস্রোত, সেখানেই জ্যোতি বসু 'লাল সেলাম' ধ্বনি। এর কখনও ব্যতিক্রম হয়নি।

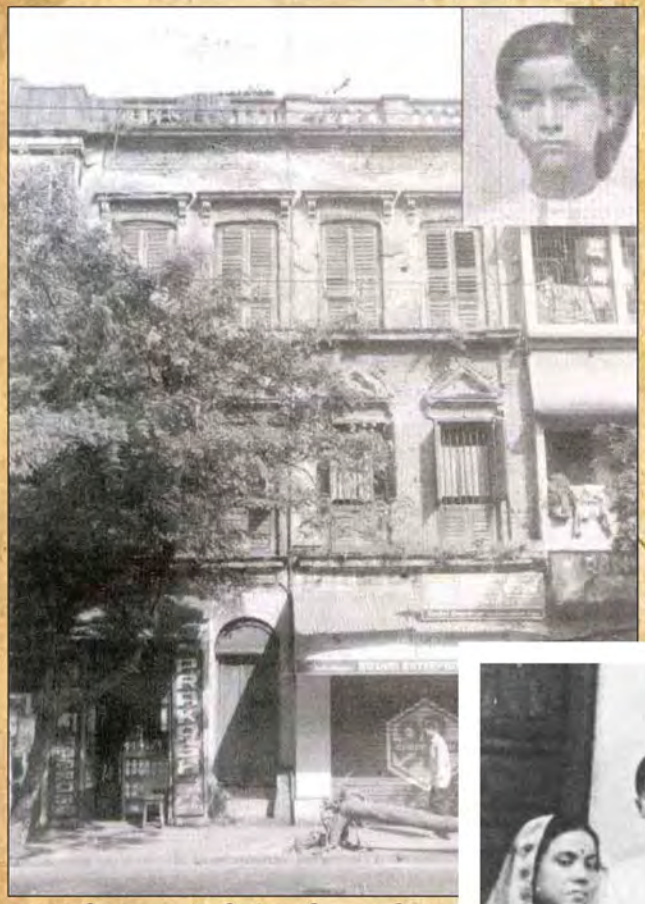

৪৩/১, হ্যারিসন রোডের এই বাড়িতেই জন্মেছিলেন জ্যোতি বসু।

১৯১৪

৮ই জুলাই

জন্ম কলকাতায় হ্যারিসন রোডের একটি বাড়িতে। মা হেমলতা দেবী, বাবা নিশিকান্ত বসু।

বসু পরিবার। মা হেমলতা দেবী ও বাবা নিশিকান্ত বসুসহ পরিবারের বড়দের সঙ্গে কৈশোরের জ্যোতি বসু (বাঁদিক থেকে দ্বিতীয়)।

বেশ কিছুদিন কাটিয়েছেন ধর্মতলায় হিন্দুস্থান বিল্ডিং-এর ভাড়া বাড়িতে। ৬বছর বয়সে জ্যোতি বসুকে ভর্তি করা হয় লরেটো স্কুলে। পরে ভর্তি হন সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। ১৯২৪ সালে নিশিকান্ত বসু হিন্দুস্থান পার্কে নিজে বাড়ি তৈরি করে সেখানে সপরিবারে বসবাস শুরু করেন। সেন্ট জেভিয়ার্স থেকেই জ্যোতি বসু সিনিয়র কেমব্রিজ ও ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। পরে ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন।

আদি বাড়ি ঢাকা জেলার বারদি গ্রামে।

আদি বাড়ি ঢাকা জেলার বারদি গ্রামে। বর্তমানে বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও থানায়।

বিলেত যাওয়ার আগে। তখন ২১ বছর বয়স।

সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়াকালীন ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। ঐ বিদ্রোহের বিরোধিতা করে স্কুলে লিফলেট বিতরণ করা হয়। জ্যোতি বসু তার প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল, বিপ্লবীরা তো দেশের স্বার্থেই বিদ্রোহ করেছেন। তাহলে তাঁরা অন্যায়টা কী করেছেন? পুলিসী আক্রমণে বিপ্লবীদের মৃত্যুর খবরে তাঁর মন খারাপ হয় এবং সেদিন ইস্কুলে যাননি। বাবাও কোনো আপত্তি করেননি।

১৯৮৭ সালের জানুয়ারিতে প্রথমবার একচল্লিশ বছর পর বাংলাদেশ সরকারের আমন্ত্রণে সস্ত্রীক জ্যোতি বসু ঢাকায় যান। সফর ছিল ২৯শে জানুয়ারি থেকে ২রা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। পরে ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানালে ২৭ নভেম্বর আবার ঢাকায়। সঙ্গে ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং অসীম দাশগুপ্ত। দু'বারই হাজার হাজার মানুষের সোচ্চার অভ্যর্থনা বসুকে। ১৯৯৬ সালের নভেম্বরে বারদির পুরনো ভিটে ঘুরে দেখছেন বসু।

১৯৩৫

জ্যোতি বসু ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত যান।

তখন ইতালিতে ফ্যাসিস্ত মুসোলিনির উত্থান হয়েছে। জার্মানিতে ক্ষমতায় এসেছে হিটলার। ফ্যাসিবাদের মোকাবিলায় সোভিয়েত ইউনিয়ন তার অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে জোরকদমে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। জাপান চীন আক্রমণ করেছে।

লন্ডনে ব্যারিস্টারি পড়ার সময় বন্ধু বীরেন গুপ্ত ও সতীজীবন দাসের সঙ্গে। বাঁদিকে দাঁড়িয়ে বসু।

তখন ইংল্যান্ডের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে চলছে রাজনীতি বিষয়ক তুমুল তর্কবিতর্ক। হ্যারল্ড ল্যাস্কি তাঁর ফ্যাসিবিরোধী ভাষণ দিচ্ছেন। এই পরিবেশে ছাত্র জ্যোতি বসু নিজেও ফ্যাসিবিরোধী পড়াশোনায় মনোনিবেশ করলেন। ভি কে কৃষ্ণমেননের নেতৃত্বে ভারতীয় ছাত্ররা তৈরি করলেন ইন্ডিয়া লিগ। জ্যোতি বসু তাঁদের অন্যতম। এই সময়ে ব্যারিস্টারি পড়তে এলেন ভূপেশ গুপ্ত, স্নেহাংশুকান্ত আচার্য্য চৌধুরী – যাঁদের সঙ্গে জ্যোতি বসুর গভীর বন্ধুত্ব তৈরি হয়েছিল।

১৯৬৯ সালে বরানগর বিধানসভা কেন্দ্রে জয়ী হওয়ার পর রেড গার্ড স্বেচ্ছাসেবকদের লাল রুমাল গলায় জড়িয়ে নিয়েছেন জ্যোতি বসু।

১৯৪০

ব্যারিস্টারি পরীক্ষা শেষ করে জ্যোতি বসু দেশে ফেরেন। তখনই মনস্থির করে ফেলেছেন কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হবেন।

কলকাতায় এসে হাইকোর্টে নাম লেখালেও সেই থেকে কোনো দিনই প্র্যাকটিস করেননি।

এই সময়ে বিশ্বযুদ্ধের চরিত্র পরিবর্তন হয়। হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করলে বিশ্বযুদ্ধ জনযুদ্ধের চরিত্র গ্রহণ করে। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় সোভিয়েত সুহৃদ সঙ্ঘ ও ফ্যাসিবিরোধী লেখক সঙ্ঘ। জ্যোতি বসু হন তার সম্পাদক। তাঁর প্রথম বিবাহ হয় ছবি ঘোষের সঙ্গে, যদিও বিয়ের অল্প কিছুদিনের মধ্যে তাঁর স্ত্রী বিয়োগ ঘটে। মা হেমলতা দেবীর মৃত্যু হয় কিছুদিন পরেই।

১৯৭০ সালের ৩১শে মার্চ পাটনায় জ্যোতি বসুর ওপর আনন্দমার্গীদের প্রাণঘাতী হামলা। আততায়ীর গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে জ্যোতি বসুর আঙুল ছুঁয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো। আততায়ীর লক্ষ্যভ্রষ্ট গুলি তাঁর বদলে প্রাণ কেড়ে নিয়েছিলো পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা কমরেড আলি ইমামের। পাটনায় এই আলি ইমামের বাড়িতেই সেদিন থাকার কথা ছিলো জ্যোতি বসুর। পরদিন ১লা এপ্রিল দমদমে বিমানবন্দরে ফেরার পর তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত বিশাল জনতার সামনে বক্তব্য রাখছেন জ্যোতি বসু। সেদিনই শহীদ মিনার ময়দানে এক বিশাল সমাবেশে তিনি বলেছিলেন, 'মানব মুক্তির সংগ্রামে জীবন পণ করতে হবে। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।' উপস্থিত ছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত ও এম বাসবপুন্নাইয়া।

১৯৭০ সালে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ভাঙার পর আইন অমান্য। গ্রেপ্তার বরণের পর পুলিসের গাড়িতে জ্যোতি বসু।

পার্টি সম্মেলনে।

কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে জ্যোতি বসুর কাজ ছিল আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট নেতাদের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করা। ১৯৪৪সালে কমিউনিস্ট পার্টি তাঁকে শ্রমিকদের সংগঠন গড়ার কাজ করতে বলে। বঙ্কিম মুখার্জি, সরোজ মুখার্জিসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তিনি শ্রমিক সংগঠনের কাজে ঘুরে বেড়াতে থাকেন যুক্তবঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশে। ১৯৪৪সালে জ্যোতি বসুদের তৎপরতায় গঠিত হয় বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন। বসু হন তার প্রথম সম্পাদক। ১৯৪৫সালে কমিউনিস্ট পার্টির বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

ভোট দিচ্ছেন।

১৯৪৬

রেলওয়ে শ্রমিক কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হুমায়ুন কবীরকে পরাস্ত করে জ্যোতি বসু অবিভক্ত বঙ্গীয় বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। সে বছর আরও দুই কমিউনিস্ট প্রার্থী বিধানসভার সদস্য হয়েছিলেন। দার্জিলিঙ কেন্দ্রে রতনলাল ব্রাহ্মণ ও দিনাজপুর কেন্দ্রে রূপনারায়ণ রায়। সুরাবর্দির নেতৃত্বে বঙ্গদেশে মুসলিম লিগ সরকার গঠন করল।

সে বছরের ২৫শে জুলাই জ্যোতি বসু বিধানসভায় প্রথম বক্তৃতা দিলেন। বিষয় বাংলার খাদ্য সঙ্কট। সেই প্রথম ভাষণই বহুজনের নজর কেড়েছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা ও অন্যান্য পত্রিকায় তা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছিল। সেই শুরু।

১৯৬০ সালের ৩১শে আগস্ট। আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে পার্টির রাজ্য দপ্তরের সামনে খাদ্য আন্দোলনের অমর শহীদদের স্মরণে।

তখন বন্দীমুক্তির দাবিতে সরব সাধারণ মানুষ। বিধানসভার ভিতরে তাঁদের দাবিকে উপস্থিত করছেন কমিউনিস্ট সদস্যরা। ২৯শে জুলাইয়ের ডাক ধর্মঘটে অচল সারা বাংলাদেশ। অচল বিধানসভাও। জ্যোতি বসু, রূপনারায়ণ রায়, রতনলাল ব্রাহ্মণরা বিধানসভায় তুলছেন জমিদারী প্রথা বিলোপের দাবি, চটকল জাতীয়করণের দাবি, কৃষকদের বিনামূল্যে জমি বিতরণের দাবি। সুনির্দিষ্ট বক্তব্যে জেরবার হচ্ছে সরকারপক্ষ। তাঁদের শ্রেণীচরিত্র উন্মোচনেও তীক্ষ্ণ জ্যোতি বসু। নৌ-বিদ্রোহীদের সমর্থনে জ্যোতি বসু, মহম্মদ ইসমাইলদের নেতৃত্বে বি এ রেলওয়েতে ২৪ ঘন্টার ধর্মঘট হচ্ছে। দাঙ্গা-বিধ্বস্ত কলকাতায় নারকেলডাঙা শ্রমিক লাইনেও উপস্থিত তিনি। সেই বছরই তিনি বেরিয়ে পড়ছেন তেভাগা সংগ্রামীদের উপর দমন-পীড়নের রিপোর্ট নিতে উত্তরবঙ্গে। ছুটে যাচ্ছেন স্নেহাংশু আচার্য্যের সঙ্গে ময়মনসিংহে হাজং যোদ্ধাদের পাশে। ময়মনসিং থেকে জ্যোতি বসুকে বহিষ্কার করলো পুলিস প্রশাসন। তেভাগা থেকে স্লোগান উঠেছে 'জান দেব, তবু ধান দেব না।' বিধানসভার ভিতরে জ্যোতি বসু বলছেন 'সামিরুদ্দিন ও শিবরামের আত্মদান ব্যর্থ হবে না।'

জ্যোতি বসু ও কমল বসু।

১৯৪৮

ডিসেম্বর মাসে জ্যোতি বসুর সঙ্গে বিবাহ হয় কমল বসুর। **স্বাধীন দেশে বিধানসভা অধিবেশনের প্রথম দিনেই জনসাধারণের উপর কংগ্রেসী সরকারের পুলিসী লাঠি ও কাঁদানে গ্যাস।**

বিধানসভায় প্রফুল্ল ঘোষের কালাকানুনের বিরোধিতা করছেন জ্যোতি বসু। তাঁর দৃপ্ত ঘোষণা, 'সর্বশক্তি দিয়ে এ কালাকানুন আমরা প্রতিরোধ করব।' এই পরিস্থিতিতেই কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হলো।

পার্টির রাজ্য দপ্তরে সরোজ মুখার্জি, হরেকৃষ্ণ কোঙার, জ্যোতি বসু, আবদুল্লাহ রসুলসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

১৯৫২ সালে কাকাবাবুর সঙ্গে বরানগরে নিজ নির্বাচনী কেন্দ্রে।

১৯৫২

পুত্র চন্দন বসুর জন্ম হয়। **১৯৫১সালে নবপর্যায়ে দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকা শুরু হলে জ্যোতি বসু হন সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি।** ১৯৫২ সালের নির্বাচন পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন।

১৯৪৮

বিনাবিচারে গ্রেপ্তার হলেন জ্যোতি বসু। মুক্তি পেলেন ৩মাস পর। পার্টির পরামর্শে আত্মগোপন করছেন। ছদ্মবেশে এবং 'বকুল' ছদ্মনামে নেতৃত্বের নির্দেশ গোপনে পৌঁছে দিচ্ছেন। সহযোদ্ধাদের সঙ্গে রান্না করছেন, ঝাঁট দেওয়া, বাসন ধোওয়া ইত্যাদি। গেরস্থালির কাজ সামলাচ্ছেন, তেলেঙ্গানার সংগ্রামীদের মুক্তির দাবিতে ছুটে যাচ্ছেন জওহরলাল নেহরুর কাছে, বিধায়ক হিসাবে প্রাপ্য অর্থ তুলে দিচ্ছেন পার্টি তহবিলে এবং পার্টির ভাতায় সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কাজ করছেন শৃঙ্খলার সঙ্গে।

১৯৫২ সালে জন্ম হলো একমাত্র সন্তান চন্দন বসুর। তাঁকে কোলে নিয়ে।

১৯৫২

স্বাধীন ভারতে প্রথম নির্বাচনে বরানগর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীকে পরাস্ত করে তিনি দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচিত হলেন। এই নির্বাচনে কমিউনিস্টদের আসন সংখ্যা বেড়ে হলো ২৮ জন। কিন্তু সেদিন বিধানসভায় অধ্যক্ষ হাস্যকর যুক্তি দেখিয়ে তাঁকে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি দেননি, তবে প্রধান বিরোধী দলের নেতা হিসাবে মেনে নেন।

বিধানসভার করিডরে মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায়ের সঙ্গে বিরোধী দলনেতা জ্যোতি বসু।

১৯৫৪ সালে শিক্ষকদের এক সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন জ্যোতি বসু।

১৯৫৩

ট্রামভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলনের সময় পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল। ১৯৫৪সালে শিক্ষক আন্দোলনের উপর দমন-পীড়নের নিন্দায় জ্যোতি বসুর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া গেছে। পুলিসের গ্রেপ্তার এড়াতে সাতদিন আশ্রয় নিয়েছিলেন বিধানসভায়। আবার বিধানসভাতে বসেই শিক্ষকদের দাবি নিয়ে সরকারপক্ষের সঙ্গে মীমাংসা করিয়েছিলেন। কিন্তু সাতদিন পর বিধানসভা থেকে বেরোতেই পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করল। জেলে আটকে রাখল দু'দিন।

১৯৬৯ সালে মহাকরণে উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু।

১৯৫৭

নির্বাচনে বরানগরে কংগ্রেস প্রার্থী কানাইলাল ঢোলকে পরাস্ত করে তৃতীয়বারের জন্য নির্বাচিত হলেন জ্যোতি বসু। এই বিধানসভাতেই বসুকে বিরোধী দলনেতার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলেন অধ্যক্ষ।

১৯৫৮ সালে জ্যোতি বসুই প্রথম কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের দাবিতে বিধানসভায় আলোচনা করেছিলেন। প্রস্তাব দিয়েছিলেন এই দাবিতে সকল দল মিলে কেন্দ্রের কাছে ডেপুটেশন দেবার। সেদিন তাঁর কিছু দাবির যৌক্তিকতা ডাঃ রায়ও স্বীকার করে নিয়েছিলেন। জ্যোতি বসুকেই দেখা গেছে খাদ্য আন্দোলনের সময় নৃশংস কংগ্রেস সরকারের বর্বরতার ও ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিতে। কায়েমীস্বার্থের চক্ষুশূল হয়েছিলেন বলেই ১৯৫৯ সালে কংগ্রেসী সমাজবিরোধীরা বরানগরে তাঁর উপর আক্রমণ করেছিল। কিন্তু এ ঘটনায় কোনো মামলা হয়নি। কাউকে শাস্তি দেওয়া হয়নি।

১৯৬২ সালে মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায়ের সঙ্গে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনারত বিরোধী দলনেতা জ্যোতি বসু।

১৯৬৬ কলকাতার রাজপথে ভুখ মিছিলে জ্যোতি বসু ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

১৯৫৩-৫৪

ষষ্ঠ রাজ্য সম্মেলনে তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন। টানা ১৯৬১সালের জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি ঐ পদে ছিলেন।

১৯৬৮ সালের ৫-১২ই এপ্রিল বর্ধমানে অনুষ্ঠিত হয় সি পি আই(এম)-র আদর্শগত প্লেনাম। অধিবেশনের মাঝে আলোচনারত পি সুন্দরাইয়া, জ্যোতি বসু ও প্রমোদ দাশগুপ্ত। রয়েছেন বিনয় চৌধুরী।

বর্ধমান প্লেনামের সময় হরেকৃষ্ণ কোঙারের সঙ্গে আলাপচারিতায়।

১৯৬২

নির্বাচনে জ্যোতি বসু চতুর্থবারের জন্য জিতে এলেন বরানগর কেন্দ্র থেকেই। এবার পরাজিত হলেন কংগ্রেসেরই ধীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। ১৯৬৩সালে বিধানসভার অভ্যন্তরে তাঁকে শুনতে হয়েছে 'চীনের দালাল' ও আরও কত না বিশেষণ। সেদিন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন জ্যোতি বসু। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ সম্পর্কে পার্টির বক্তব্যকে দৃঢ়তার সঙ্গে উপস্থিত করেছিলেন তিনি। তিনি বলেছিলেন শান্তিপূর্ণভাবেই দু'দেশের মধ্যে বিরোধ মিটিয়ে নিতে হবে। এই সময়েই কংগ্রেস সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করেছিল আরও অনেক পার্টিনেতাদের সঙ্গে অথচ, সংঘর্ষ তখন থেমে গেছে। বসু আটক রইলেন এক বছরের জন্য। জেলে থাকাকালীনই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়।

প্রবল মতাদর্শগত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করল সি পি আই (এম)।

সেই লড়াইয়েরও অন্যতম নেতা, জ্যোতি বসু। ১৯৬১সালে অন্ধ্র প্রদেশের বিজয়ওয়াদায় অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির শেষ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। তখন থেকেই পার্টিতে মতাদর্শগত বিরোধ প্রকট হয়েছে। ডাঙ্গের নেতৃত্বাধীন সংশোধনবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে বত্রিশজন জাতীয় পরিষদ সদস্য ওয়াকআউট করেছিলেন জ্যোতি বসু তাঁদের মধ্যে ছিলেন।

১৯৬৪

সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক মতাদর্শগত সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে ১৯৬৪ সালে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদ থেকে বের হয়ে এলেন ৩২ জন সদস্য। মার্কসবাদীদের উদ্যোগে দক্ষিণ কলকাতার ত্যাগরাজ হলে অনুষ্ঠিত হলো পার্টির সপ্তম কংগ্রেস। সপ্তম কংগ্রেসের প্রতিনিধি অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন জ্যোতি বসু। মঞ্চে রয়েছেন (ডানদিকে থেকে বাঁদিকে) হরেকৃষ্ণ কোঙার, এ কে গোপালন, এম বাসবপুন্নাইয়া, জগজিৎ সিং লয়ালপুরী, হরকিষাণ সিং সুরজিত, ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ এবং পি সুন্দরাইয়া।

সপ্তম কংগ্রেস চলাকালীন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনারত।

তেনালী কনভেনশনেরও অন্যতম শীর্ষ সংগঠক ছিলেন জ্যোতি বসু। ১৯৬৪ সালে কলকাতায় পার্টির সপ্তম কংগ্রেসের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন জ্যোতি বসু। এই কংগ্রেস থেকে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটি তথা পলিট ব্যুরোর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৫সালে সি পি আই (এম) কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র পিপলস ডেমোক্র্যাসি আত্মপ্রকাশ করলে জ্যোতি বসু হন তাঁর প্রথম সম্পাদক। ১৯৬৭সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে যে বাম হঠকারিতার বিরুদ্ধে লড়াই সংগঠিত হয়েছিল বসু ছিলেন তার সামনের সারিতে। আর তাই নকশালপন্থী অতিবিপ্লবীদের আক্রমণে ও ব্যক্তিগত কুৎসার অন্যতম লক্ষ্যবস্তু ছিলেন জ্যোতি বসু।

১৯৫৪-৫৫ আন্দোলনের ময়দানে। গ্রেপ্তারের জন্য অপেক্ষা করছে পুলিস।

১৯৬৯ সাল। মহাকরণের করিডরে উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু।

১৯৬৭

কংগ্রেসের অপশাসনে মানুষের ক্ষোভ তখন চরমসীমায়। বরানগর কেন্দ্রে কংগ্রেসের অমরেন্দ্র ভট্টাচার্যকে হারিয়ে বসু নির্বাচিত হলেন পঞ্চমবারের জন্য। প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হলো প্রথম অকংগ্রেসী সরকার, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা। আসন সংখ্যার বিচারে সি পি আই (এম) দাবি করতে পারত মুখ্যমন্ত্রিত্বের। জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী হতে পারতেন। কিন্তু বাংলা কংগ্রেস বেঁকে বসলো। অজয় মুখার্জি মুখ্যমন্ত্রী হলেন। জনগণের স্বার্থে সি পি আই (এম) তা মেনে নিলো। **জ্যোতি বসু তার উপমুখ্যমন্ত্রী।**

অস্থির রাজনীতি, দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজনীতির পালাবদল। বিশ্বাসঘাতকদের জন্য ভেঙে গেল যুক্তফ্রন্ট।

তবু ১৯৬৯সালে বরানগর কংগ্রেসের অমরেন্দ্র ভট্টাচার্যকে পরাজিত করে জনগণ জ্যোতি বসুকেই জয়ী করলেন। ১৯৬৯সালে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আর একবার দেখলেন তাঁর দৃঢ়চিত্ততা। একদল মারমুখী পুলিসকর্মী বিধানসভায় জ্যোতি বসুর ঘরে ঢুকে তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের সামনে আত্মসমর্পণ করলেন।

১৯৬৭ সালের ২রা মার্চ। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিচ্ছেন জ্যোতি বসু। পাশে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি।

১৯৬৮ সালের ৫-১২ ই এপ্রিল বর্ধমানে অনুষ্ঠিত হলো সি পি আই(এম)-র আদর্শগত প্লেনাম। অধিবেশনের মঞ্চে কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্যদের একসাথে ছবি।

১৯৫৪-৫৫ সাল। আন্দোলনের ময়দানে। বক্তব্য রাখছেন জ্যোতি বসু।

জনগণের সমাবেশ বাড়ছে। বাড়ছে শত্রুও। তাই ১৯৭০ সালে পাটনা স্টেশনে আনন্দমার্গীরা তাঁকে হত্যার চেষ্টা করল। অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন। ধিক্কারে ফেটে পড়ল গোটা পশ্চিমবঙ্গ, গোটা দেশ। তখন পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসন। সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পশ্চিমবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। বারুইপুরে জনসভা করতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন জ্যোতি বসু ও জ্যোতির্ময় বসু।

প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার শপথ নেওয়ার পর জনতার মাঝে। সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জিসহ অন্যরা রয়েছেন।

১৯৭১ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে শ্যামপুকুরে খুন হলেন শ্রদ্ধেয় জননেতা হেমন্ত বসু। উত্তরবঙ্গ থেকে ফিরেই সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় এ ঘটনার দায় চাপালেন সি পি আই (এম)-র ঘাড়ে। ফলে শহরের কিছু মানুষ মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হলেন। তবু ঐ নির্বাচনে সি পি আই (এম) একক বৃহত্তম দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলো। **জ্যোতি বসু জিতলেন বরানগরেই।** পরাজিত প্রার্থী অজয় মুখার্জি। কিন্তু সর্বাধিক আসন পাওয়া সত্ত্বেও সি পি আই (এম)-কে সরকার গঠনের জন্য ডাকলেন না রাজ্যপাল।

কার্যত পশ্চিমবঙ্গে জরুরী অবস্থা শুরু হয়ে গিয়েছিলো ১৯৭২ সাল থেকেই।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্টের এক নির্বাচনী সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন জ্যোতি বসু।

জনগণের জয়যাত্রাকে পথ আটকাতেই ১৯৭২ সালে কংগ্রেস বেছে নিলো রিগিংয়ের রাস্তা।

সেদিন নির্বাচনের নামে পুরোপুরি প্রহসন হয়েছিলো। বরানগরে গিয়ে জ্যোতি বসু স্বচক্ষে দেখলেন তাদের কুকীর্তি। বেলা বারোটার মধ্যেই বসু ঐ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি সিদ্ধার্থ রায়ের বিধানসভাকে 'জোচ্চোরদের বিধানসভা' বলে অভিহিত করেছিলেন। শাসকদলের পক্ষে সাহস হয়নি তাঁর বিরুদ্ধে বিধানসভায় স্বাধিকারভঙ্গের প্রস্তাব আনার। পশ্চিমবঙ্গের একাত্তর থেকে সাতাত্তরে আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের ও জরুরী অবস্থার দিনগুলিতে জনগণ জ্যোতি বসুকে পেয়েছেন তাঁদের পাশে এবং সামনে। বহু নেতা, শতশত কর্মীর রক্ত ঢালা পিচ্ছিল পথে তাঁকে এগোতে হয়েছে। এগিয়েছেন রাজ্যের জনগণও।

১৯৭৭

গণ-আন্দোলনের তরঙ্গশীর্ষেই বামফ্রন্ট সরকারের আবির্ভাব। সাতগাছিয়া কেন্দ্রে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে বিধানসভায় ফিরে এলেন জ্যোতি বসু। **এবার তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।** সেদিন প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁকে প্রথম প্রশ্নই ছিলো, আপনি কি মনে করেন আপনার সরকার স্থায়ী হবে? জ্যোতি বসু বলেছিলেন, আমাদের বিশ্বাস আছে স্থায়ী হবে। কারণ অনেক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছে বামফ্রন্ট।

১৯৭৭ সালে নতুন কেন্দ্র সাতগাছিয়াতে প্রার্থী। নিজ কেন্দ্রে নির্বাচনী প্রচারে।

দুই অন্তরঙ্গ সুহৃদ।
জ্যোতি বসু ও স্নেহাংশু আচার্য। দু'জনেই
ভালোবাসতেন ক্রিকেট।

বর্ধমানে এক ছাত্র সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু।

ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলনের 'নবরত্ন'।
সি পি আই (এম) গঠনের পর প্রথম পলিট ব্যুরোর সদস্য (বাঁদিক থেকে বসে) প্রমোদ দাশগুপ্ত, জ্যোতি বসু, পি সুন্দরাইয়া, বি টি রণদিভে, এ কে গোপালন। পিছনে (বাঁদিক থেকে দাঁড়িয়ে) পি রামমূর্তি, এম বাসবপুন্নাইয়া, ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ ও হরকিষাণ সিং সুরজিৎ।

১৯৭৭

জ্যোতি বসু যখন পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হন তখন তাঁর বয়স ৬৩ বছর। সাধারণত এই বয়সে মানুষ অবসর নেন। কিন্তু জ্যোতি বসুর ক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হলো। মুখ্যমন্ত্রী হয়েই বসু ঘোষণা করলেন, আমরা কেবলমাত্র রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে সরকার পরিচালনা করবো না। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। জনসাধারণ ও বিভিন্ন গণসংগঠনের পরামর্শ নিয়েও এই সরকার চলবে। জ্যোতি বসু মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই সিদ্ধান্ত করেন মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার।

মানুষই স্পন্দিত বুকে, প্রতিশব্দ লড়াইয়ে

শপথ নিয়ে মহাকরণের সামনে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ১৭০০০রাজনৈতিক বন্দীকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া হয়। ১০,০০০মামলা প্রত্যাহার করা হয়। রাজনৈতিক কারণে কর্মচ্যুত প্রত্যেক সরকারী কর্মচারীর চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বস্তুত তাঁর নেতৃত্বে প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের সিদ্ধান্তগুলির ফলাফল ছিলো সুদূরপ্রসারী। অগ্রাধিকার পেয়েছিলো ভূমি সংস্কারের কাজ। চালু হয় অপারেশন বর্গা। ফিরিয়ে দেওয়া হয় শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার। বসু ঘোষণা করেন, শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে পুলিসী হস্তক্ষেপ ঘটবে না। তাঁরই মন্ত্রিসভা নিয়মিত পঞ্চায়েত ও পৌরসভা নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭৮সালে অনুষ্ঠিত হয় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন।

১৯৭৭ সালের ২১ শে জুন। রাজ্যপাল এ লে ডায়াসের কাছে শপথ নিলেন প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু।

মানুষই স্পন্দিত বুকে, প্রতিশব্দ লড়াইয়ের

প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম বাজেট পেশের আগে অর্থমন্ত্রী ড. অশোক মিত্রের সঙ্গে শেষ মুহূর্তের আলোচনা।

বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার দিন থেকে বিশেষত এরাজ্যের বিরোধীপক্ষ সরকারের সঙ্গে শুধু অসহযোগিতাই নয়, পদে পদে তার কাজে বাধা সৃষ্টি করে এসেছে। কিন্তু সেই বাধা, ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে বামফ্রন্ট সরকার তার ২১দফা কর্মসূচী রূপায়িত করেছে, যার নেতৃত্বে ছিলেন জ্যোতি বসু। ১৯৭৮সালেই পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা হয়। এই বন্যার মোকাবিলায় আশ্চর্য সাফল্য দেখিয়েছিলো বামফ্রন্ট সরকার। এক বিরাট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলো সেদিনের নবগঠিত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত। কোনও মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে আসেননি।

বিগ্রেডের সমাবেশ।

উত্তমকুমারসহ বাংলা সিনেমার কলা-কুশলীদের সঙ্গে আলাপচারিতায়।

১৯৮৪ সালে দমদম বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে স্বাগত জানাচ্ছেন জ্যোতি বসু।

১৯৮০সালে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস পুনরায় দিল্লিতে ক্ষমতায় ফেরে। সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের লম্ফঝম্ফ শুরু হয়। সেদিন জ্যোতি বসু বলেছিলেন, এই জয় গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা বিপন্ন এই অজুহাতে কলকাতার রাস্তায় মারমুখী হয়ে ওঠে কংগ্রেস।

এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অবিচার চরম আকার নেয়।

মানুষই স্পন্দিত বুকে, প্রতিশব্দ লড়াইয়ের

এক অনুষ্ঠানে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে। রয়েছেন বিজয়া রায় ও কমল বসু।

মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে জ্যোতি বসুর বিরাট ভূমিকা ছিলো কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের প্রশ্নটি সর্বভারতীয় রাজনীতির অঙ্গনে তুলে নিয়ে আসা। বৃহৎ শিল্প স্থাপনে কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রথা, মাসুল সমীকরণ নীতি, রাজ্যগুলির আর্থিক সামর্থ্যকে শুকিয়ে মারার চক্রান্তের বিরুদ্ধে বসু ছিলেন সরব। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৮৩সালে সারকারিয়া কমিশন গঠন করতে বাধ্য হয়।

মন্ত্রিসভার অন্যতম সহকর্মী বিনয় চৌধুরীর সঙ্গে। মহাকরণে।

১৯৮৬ সালে দার্জিলিঙ জেলায় গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন বিচ্ছিন্নতাবাদী রূপ নেয়। তাদের হিংসাত্মক আন্দোলনে দার্জিলিঙ অশান্ত হয়ে ওঠে। এই সময়ে জ্যোতি বসুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় রাজ্যভাগ প্রতিহত করা যায় এবং গঠিত হয় দার্জিলিঙ গোর্খা পার্বত্য পরিষদ।

মানুষের স্পন্দিত বুকে, প্রতিস্পর্ধী লড়াইয়ের

লন্ডনে। ১৯৮৬ সালে।

কেন্দ্রীয় অবিচারের বিরুদ্ধে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ যখন সরব, তখন ১৯৮৭'র বিধানসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী কংগ্রেসের হয়ে প্রচারে এলেন। প্রতিশ্রুতি দিলেন ১০০৭কোটি টাকার সাহায্য প্রকল্পের। সেদিন জ্যোতি বসু এই অবাস্তব প্রতিশ্রুতির ফানুস চুপসে দিয়ে বলেছিলেন, টাকার থলি দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে কেনা যাবে না। সেই নির্বাচনের ফলাফলেই তা প্রমাণিত হয়েছিলো।

তিনি প্রকৃত অর্থেই ছিলেন এক সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট নেতা। এই দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি ভারতবর্ষের এমন কোনো প্রান্ত নেই যেখানে যাননি। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক বাঁক ও মোড়ে তাঁর বিচক্ষণ হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়েছে বারে বারে। বিরোধীদের কাছ থেকে সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছেন নিজ ব্যক্তিত্বের প্রভাবে। প্রচারের জন্য তিনি কোনদিনই লালায়িত ছিলেন না। বরং প্রচারমাধ্যমই তাঁকে অনুসরণ করেছে।

১৯৭৭ সালে বর্ধমানে এক ছাত্র সমাবেশে।

মেদিনীপুরে ঘরছাড়া মানুষদের সঙ্গে।

১৯৯৭ সালের ২২-৩০ শে জুলাই দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যান বসু। জোহানেসবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির নিহত নেতা ক্রিস হানির স্মারকের সামনে।

সারা জীবনে গ্রেট ব্রিটেন ছাড়াও সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা, ইজরায়েল, হল্যান্ড, জার্মানি, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ডসহ বহু দেশে ভ্রমণ করেছেন। পৃথিবীর বহু নামজাদা রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন তিনি। বহির্বিশ্বে ভারতের কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে তাঁর থেকে বেশি পরিচিতি আর কারোরই হয়নি।

মানুষই স্পন্দিত বুকে, প্রতিশব্দ লড়াইয়ের

১৯৮৬ সালের নভেম্বরে বাংলাদেশ সফরে। সঙ্গে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও অসীম দাশগুপ্ত (ছবিতে নেই)। ঢাকা বিমানবন্দরে স্বাগত জানাচ্ছেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ।

২০০০ সালের নভেম্বরে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে অবসর নেন। তখনই তিনি বলেছিলেন, আমি মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে অবসর নিচ্ছি—তবে রাজনীতি থেকে নয়। কমিউনিস্টরা অবসর নেয় না। যতদিন শরীর অনুমতি দেবে ততদিন মানুষের মুক্তির সংগ্রামে কাজ করে যাবো।

ধর্মতলার এস. এন. ব্যানার্জি রোডে মার্কিন প্রচার দপ্তরের সামনে পায়রা উড়িয়ে শান্তি মিছিলের সূচনা করছেন জ্যোতি বসু। ১৯৮২ সালের ২৩ শে সেপ্টেম্বর। রয়েছেন সুধাংশু দাশগুপ্ত, বিমান বসু, বিশ্বনাথ মুখার্জি প্রমুখ।

ইতিহাস কীভাবে তাঁকে মনে রাখবে তা নিয়ে চিরকালই তিনি ছিলেন নিস্পৃহ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে, তথা ভারতে, উথালপাতাল করা গণ-আন্দোলনের তরঙ্গে শীর্ষেই তিনি উদ্ভাসিত। কমরেড জ্যোতি বসু শুধু এক ঐতিহাসিক চরিত্র নন — এক চলমান ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা। জ্যোতি বসু মানে এদেশে সমাজবদলের লড়াইয়ের চড়াই উৎরাই। আনতশির লালপতাকা হাতে সময়ের সারথী।

মানুষই স্পন্দিত বুকে, প্রতিশব্দ লড়াইয়ের

আন্দোলনের তরঙ্গেই জনপ্রিয়তম জননেতা

ব্রিগেডের জনসমুদ্রে।

ধর্মতলা লেনিন মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।

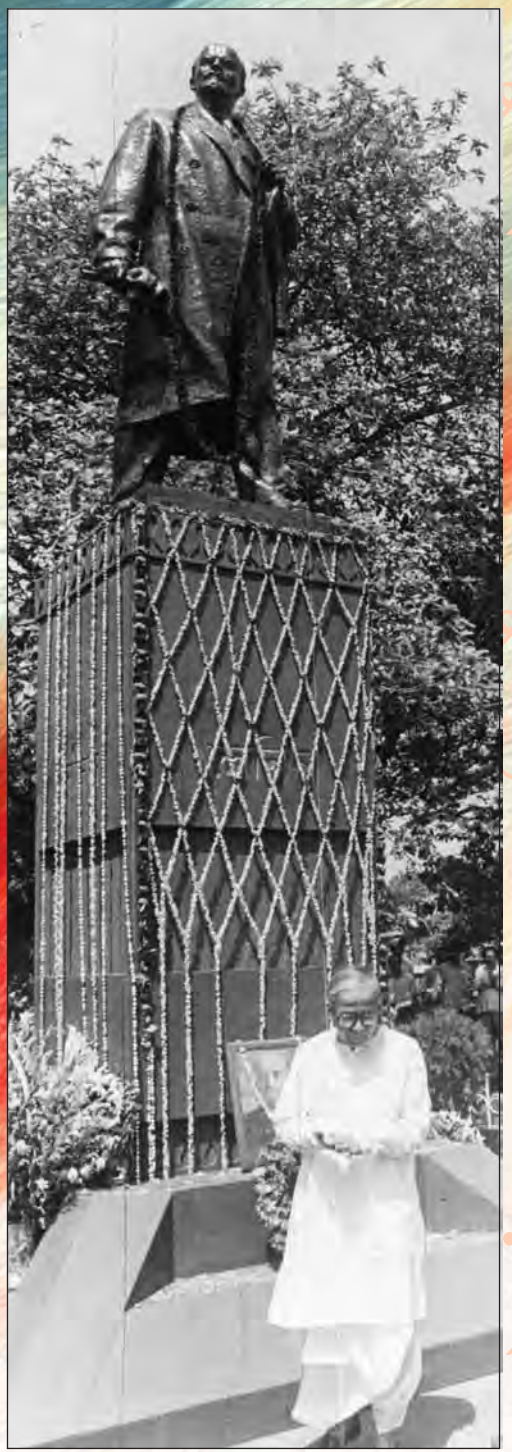

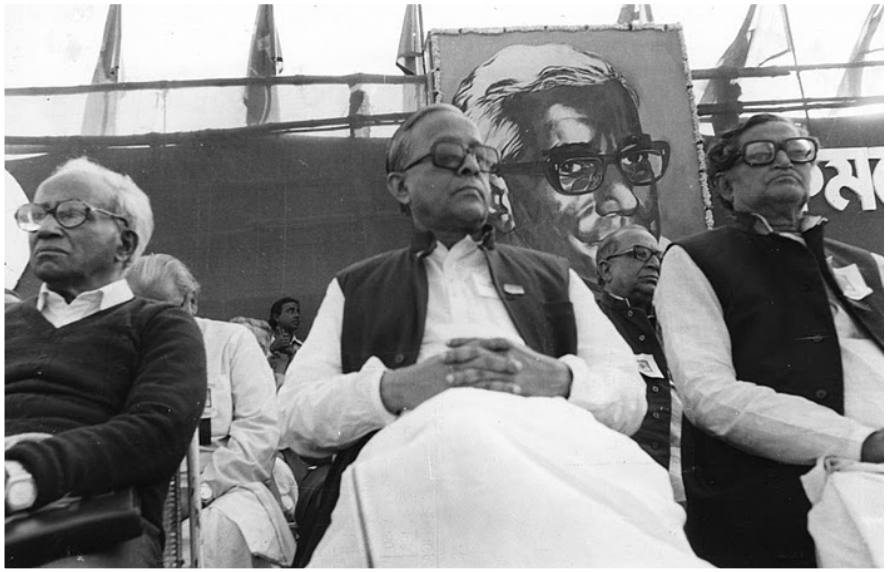

ই এম এস নাম্বুদিরিপাদ, জ্যোতি বসু ও সরোজ মুখার্জি। বিগ্রেডে প্রয়াত কমরেড প্রমোদ দাশগুপ্তের স্মরণসভায়। ১৯৮২ সালের ৭ই ডিসেম্বর।

বিশ শতকের চারের দশক থেকে নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দশক বিশেষত এ বাংলায় গরিব মেহনতী মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনযুদ্ধ যেন বাঁধা তাঁর স্মৃতির গ্রন্থিতেই।

মানুষের স্পন্দিত বুকে, প্রতিটি লড়াইয়ের

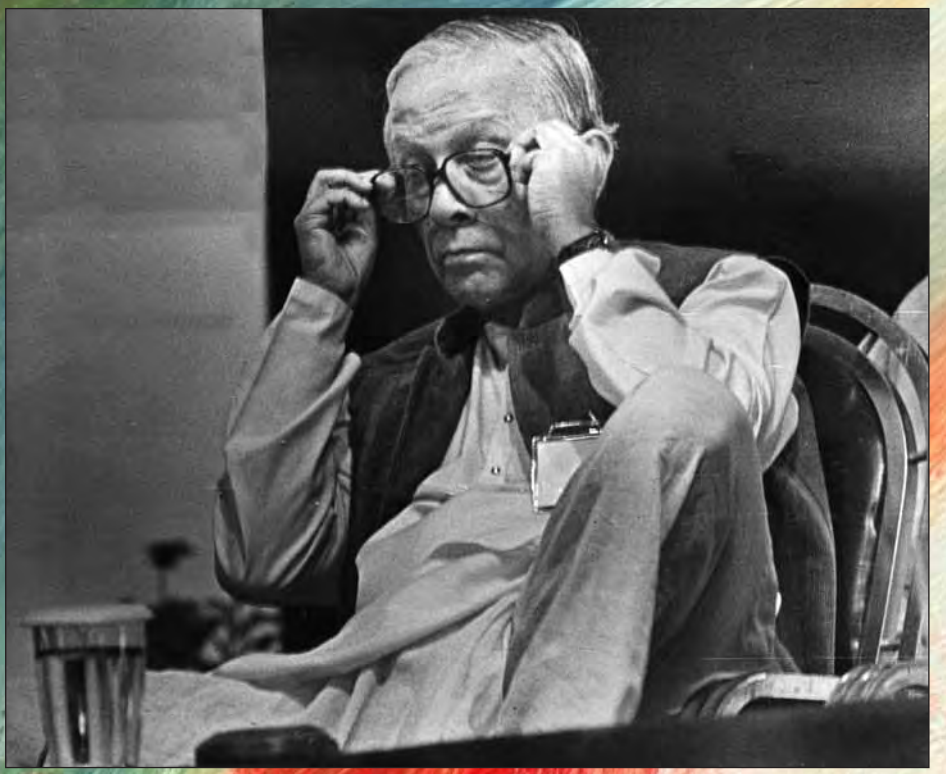

বাস্তুহারাদের পুনর্বাসনের দাবিতেও বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে তিনি সমান সক্রিয়। ষাটের দশকে ছাত্র-যুব-মহিলা, কৃষক, মধ্যবিত্ত কর্মচারী, শ্রমিকদের সংগঠিত আন্দোলনের প্রতিটি পর্বে ঝলসে উঠেছেন কমরেড জ্যোতি বসু। যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সূত্র ধরেই গড়ে উঠেছে বামফ্রন্ট।

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার গোটা দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কাছে আশা-আকাঙ্ক্ষার এক নতুন মাত্রা।

১৯৮৭ সালের এপ্রিলে মুম্বাইতে সি আই টি ইউ-র ষষ্ঠ সম্মেলনে বি টি রণদিভে ও সমর মুখার্জির সঙ্গে।

মানুষই স্পন্দিত বুকে,প্রতিশব্দ লড়াইয়ে

১৯৭৮ সালে 'ফুটবলের যাদুকর' পেলেকে কলকাতায় স্বাগত জানাচ্ছেন।

লতা মঙ্গেশকর ও আশা ভোঁসলের সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে। রয়েছেন রমাপ্রসাদ গোয়েঙ্কা।

সকালে নিয়মিত গণশক্তি খুঁটিয়ে পড়া ছিল তার প্রতিদিনের অভ্যাস।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি। ১৯৯১ সালে চতুর্থ বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়ে।

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন। ১৯৮৮ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর।

সীমান্তবর্তী রাজ্য এই অজুহাতে ইন্দিরা গান্ধী বিধাননগরে ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স করার অনুমতি দেননি। অবিচার চলতে থাকে হলদিয়া পেট্রোকেম ও বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণেও। সেদিন জ্যোতি বসুর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিলো, বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প আমরা তৈরি করবোই। এ হলো পশ্চিমবঙ্গের আত্মমর্যাদার প্রতীক। সেদিন তাঁর আহ্বানে সারা দিয়ে হাজার হাজার যুবক-যুবতী বক্রেশ্বর প্রকল্পে রক্তদান করেছিলো। বহু মানুষ তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণে অর্থ সাহায্য করেছিলেন, স্বেচ্ছাশ্রম দিয়েছিলেন। এই নিয়ে কিছু সংবাদপত্র ব্যঙ্গ করলেও বক্রেশ্বর প্রকল্প নির্মাণের কাজ শেষ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে।

মানুষই স্পন্দিত বুকে, প্রতিশব্দ লড়াইয়ের

১৯৮৭ সালের ৩১ শে মার্চ। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন জ্যোতি বসু। শপথবাক্য পাঠ করাচ্ছেন রাজ্যপাল নুরুল হাসান।

মানুষই স্পন্দিত বুকে, প্রতিশব্দ লড়াইয়ে

দীর্ঘ বৈষম্যের পর হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস্‌-এর শিলান্যাস। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। ১৯৮৯ সালের ১৫ই অক্টোবর।

জ্যোতি বসুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মানুষ পদযাত্রা করেছেন হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস প্রকল্প নির্মাণের জন্য। ১৯৮৫ সালেই বামফ্রন্ট সরকার যৌথ উদ্যোগে বৃহৎ শিল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়। অবশেষে হলদিয়া প্রকল্পও রূপায়িত হয় কেন্দ্রের সহযোগিতা ছাড়াই।

২০০০ সালের ২রা এপ্রিল। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস্‌ কারখানা ঘুরে দেখছেন জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সোমনাথ চ্যাটার্জি প্রমুখ।

মানুষের কম্পিত বুকে, প্রতিবাদ লড়াইয়ের

কমরেড বিজয় মোদকের সঙ্গে।

দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে শেষদিন পর্যন্ত গণ-আন্দোলনের তিনি নেতা। মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকারও যেন নতুন সংজ্ঞায়ন ঘটেছে। আশির দশকের গোড়া থেকেই একদিকে স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী আন্দোলনকে সংগঠিত করার কাজ। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার ও পঞ্চায়েতের কাজের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকার ও গরিব মানুষের ক্ষমতার সম্প্রসারণ।

২০০০ সালের ২রা এপ্রিল। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালস্ কারখানা ঘুরে দেখছেন জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সোমনাথ চ্যাটার্জি প্রমুখ।

শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠকে জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও সোমনাথ চ্যাটার্জি।

একদিকে যেমন লড়াই করেছেন কেন্দ্রের বৈষম্যের বিরুদ্ধে, অন্যদিকে তেমনি পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণের পক্ষে গণ-সমাবেশ ঘটাতে তিনি জনতার মিছিলে।

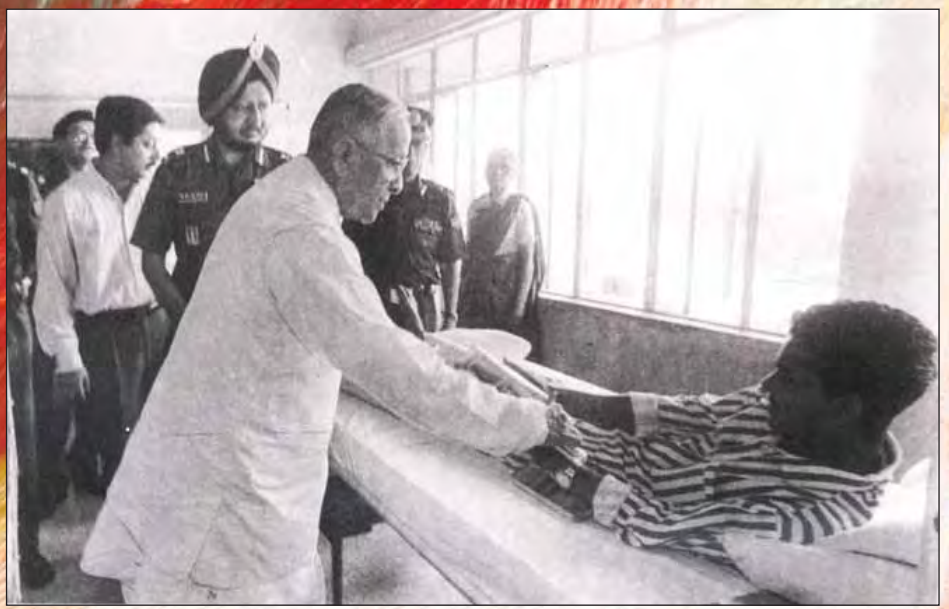

হাসপাতালে অসুস্থ রোগীর পাশে।

মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাসই গভীর রাজনৈতিক প্রত্যয়ের ভিত্তিভূমি। শেষদিন পর্যন্ত তিনি বলে গেছেন – মানুষই ইতিহাস রচনা করেন।

বাংলাকে ছাড়িয়ে...

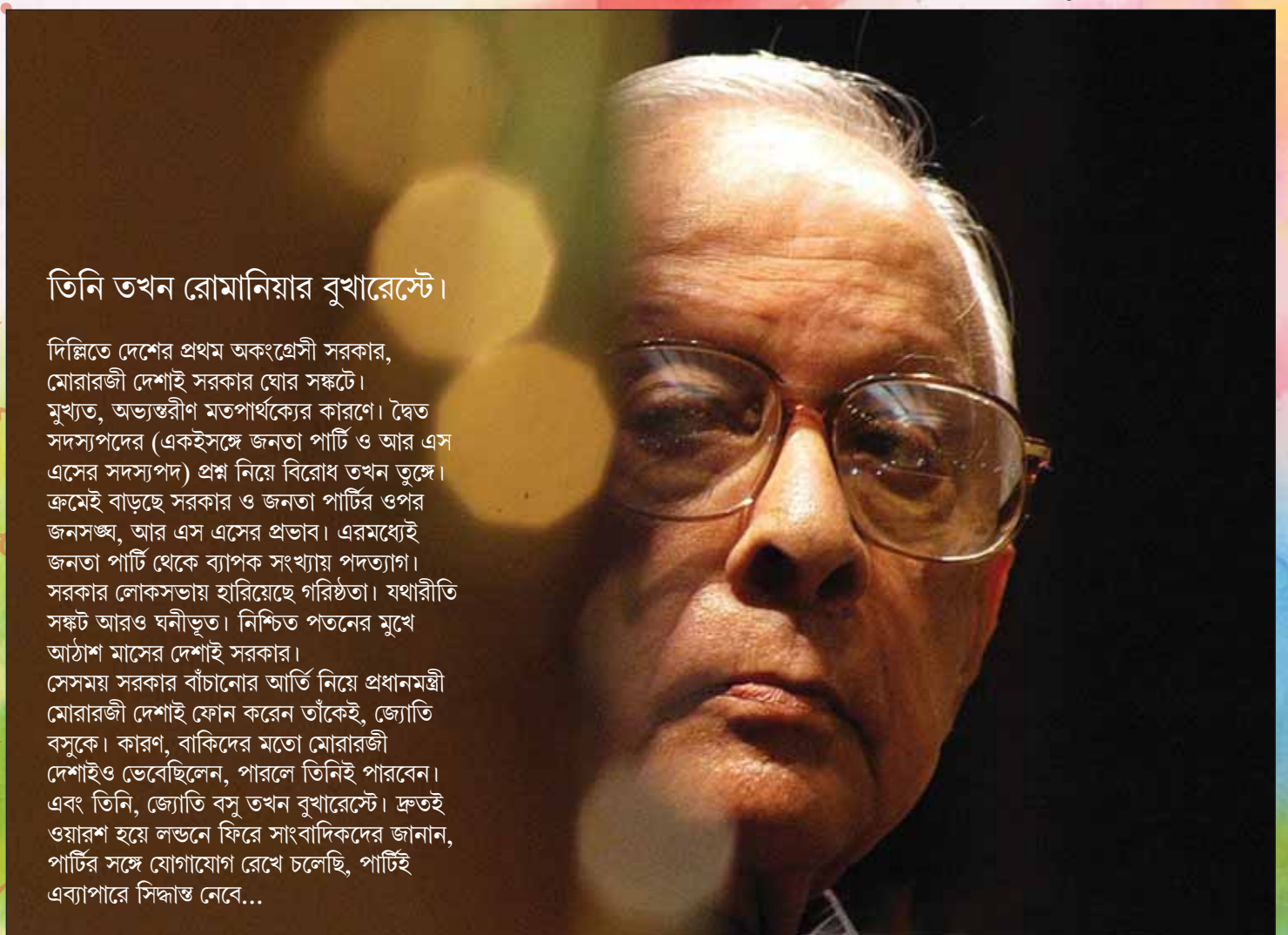

তিনি তখন রোমানিয়ার বুখারেস্টে।

দিল্লিতে দেশের প্রথম অকংগ্রেসী সরকার, মোরারজী দেশাই সরকার ঘোর সঙ্কটে। মুখ্যত, অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যের কারণে। দ্বৈত সদস্যপদের (একইসঙ্গে জনতা পার্টি ও আর এস এসের সদস্যপদ) প্রশ্ন নিয়ে বিরোধ তখন তুঙ্গে। ক্রমেই বাড়ছে সরকার ও জনতা পার্টির ওপর জনসঙ্ঘ, আর এস এসের প্রভাব। এরমধ্যেই জনতা পার্টি থেকে ব্যাপক সংখ্যায় পদত্যাগ। সরকার লোকসভায় হারিয়েছে গরিষ্ঠতা। যথারীতি সঙ্কট আরও ঘনীভূত। নিশ্চিত পতনের মুখে আঠাশ মাসের দেশাই সরকার।
সেসময় সরকার বাঁচানোর আর্তি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ফোন করেন তাঁকেই, জ্যোতি বসুকে। কারণ, বাকিদের মতো মোরারজী দেশাইও ভেবেছিলেন, পারলে তিনিই পারবেন। এবং তিনি, জ্যোতি বসু তখন বুখারেস্টে। দ্রুতই ওয়ারশ হয়ে লন্ডনে ফিরে সাংবাদিকদের জানান, পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছি, পার্টিই এব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে...

সারা বিশ্বব্যাপী সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপর্যয় এবং সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রতি তীব্র আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়েও অবিচলিতভাবে আমাদের দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনকে রক্ষা করা এবং বাস্তব পরিস্থিতির মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অনবদ্য ভূমিকা আমাদের সকলের কাছে শিক্ষণীয়। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর বিশ্বাসে কোনোদিন বিন্দুমাত্র চিড় ধরেনি।

দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে। গান্ধীমূর্তির সামনে। ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসের শেষে।

চৌ এন লাই-কে স্বাগত।

ফিদেল কাস্ত্রোকে কলকাতা বিমানবন্দরে স্বাগত জানাচ্ছেন বামপন্থী দলগুলির নেতৃবৃন্দ। ১৯৭৩ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর।

মানুষের চেতনাকে সমৃদ্ধ করেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার কথাই তিনি বারেবারে বলেছেন। পুঁজিবাদের শোষণ, অবিচার, বৈষম্যের বিরুদ্ধে তাঁর সমালোচনা ছিলো যেমন ক্ষুরধার তেমনই এই ব্যবস্থার ইতিবাচক দিকটিকেও তিনি উপেক্ষা করতেন না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াইয় করে ২৭ বছর কারারুদ্ধ ছিলেন নেলসন ম্যান্ডেলা। ১৯৯০ সালে কারামুক্তির পর কলকাতার ইডেন গার্ডেনে তাঁকে গণসংবর্ধনা দেওয়া হয় সেবছর ১৮ই অক্টোবর।

১৯৯০ সালের ২৮ শে মার্চ। প্যালেস্তাইনের মুক্তিযুদ্ধের অবিসংবাদী নেতা ইয়াসের আরাফতকে কলকাতায় স্বাগত জানাচ্ছেন জ্যোতি বসু।

পুঁজিবাদ মানব সভ্যতার শেষ কথা নয়

যে পুঁজিবাদের ভিত্তি হলো শোষণ ও শ্রেণীবিভাজন, তাকে মানব সভ্যতার শেষ কথা বলে কখনই আমরা মেনে নেব না। পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবী পতনের দিকেই শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের চাকা ঘুরবে এবং বিশ্বজুড়ে নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হবে। শ্রেণীহীন শোষণমুক্ত মানবিক ব্যবস্থাই হলো সমাজতন্ত্র যা আমাদের লক্ষ্য। সমাজতন্ত্রের পক্ষে সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী, জটিল ও শ্রমসাধ্য, একথা আমরা মানি। এটা বোঝা যাচ্ছে যে, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র বহুদিন ধরে পাশাপাশি অবস্থান করবে। অনেক উত্থান-পতন ও পশ্চাৎমুখী শক্তি এ-সময়ে কাজ করবে, কিন্তু শেষপর্যন্ত বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্র জয়ী হবেই।

(কার্ল মার্কসের ১৭৬তম জন্মদিনে প্রদত্ত ভাষণ)

মাদার টেরিজার সঙ্গে।

ইংল্যান্ডে রবীন্দ্রনাথের মর্মর মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে।

রাশিয়ার প্রতিনিধির সঙ্গে। রয়েছেন অনিল বিশ্বাস, বিমান বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

মার্কসীয় তত্ত্বের দুরূহ দিক

মার্কসীয় চিন্তা মূলত বিজ্ঞানভিত্তিক, এতে কোনো গোঁড়ামির স্থান নেই। এটি এক সৃজনশীল তত্ত্ব যা সুনির্দিষ্ট কর্মপ্রক্রিয়া নির্দেশ দিয়ে থাকে। মার্কসীয় তত্ত্বের দুরূহ দিক হলো, এর প্রয়োগ-পদ্ধতি, যা কেবল বিশেষ বাস্তব অবস্থার ওপর একান্তভাবেই নির্ভরশীল। এই তত্ত্ব বাস্তব পরিস্থিতিতে পরীক্ষিত হওয়ার দাবি রাখে। বিশ্ব-প্রকৃতির পরিবর্তন ও বিকাশ সবসময়ই দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে হয়, তা কখনোই পরাতত্ত্বভিত্তিক নয়। বিজ্ঞান জগতের প্রতিটি শাখার বর্তমান আবিষ্কারগুলি সেই সত্যকেই প্রমাণ করছে। মানবসভ্যতার সকল পর্যায়কে ব্যাখ্যা করে মার্কস তাঁর এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, অর্থনৈতিক উৎপাদন, উৎপাদন পদ্ধতি এবং উৎপাদন সম্পর্কগুলিই সমাজের চালিকাশক্তি। এর থেকেই সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তেও তিনি পৌঁছেছিলেন যে, এ যাবৎকালের সমাজের ইতিহাস হলো, শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।

(কার্ল মার্কসের ১৭৬তম জন্মদিনে প্রদত্ত ভাষণ)

কমরেড হো-চিন-মিন-এর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৯৯১ সালের জানুয়ারিতে কলকাতায় এসেছিলেন ভিয়েতনামের কিংবদন্তী মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল ভো নগুয়েন গিয়াপ। তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছেন জ্যোতি বসু। রয়েছেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

১৯৯৬, ডিসেম্বরে বাংলাদেশের সঙ্গে স্বাক্ষরিত হলো জল বণ্টন নিয়ে সেই ঐতিহাসিক চুক্তি। কেবল গঙ্গার জল চুক্তিই নয়, যে তিনবিঘা নিয়ে বছরের পর বছর ধরে সমাধান হয়নি, সেই তিনবিঘার সমাধান করে দিয়েছিলেন।

ইতালির রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৬ সালের ২৫ শে জুন বিধাননগরের বাসভবনে এসে দেখা করলেন জ্যোতি বসুর সঙ্গে। পরে উভয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি।

চে গুয়েভারার মেয়ে অ্যালেইদা মার্চ গুয়েভারার সঙ্গে। কলকাতায়।

কমিউনিস্ট দায়বদ্ধতার প্রশ্নে কোন দিন আপস করেননি কমরেড জ্যোতি বসু। তিনি ৫৫ বছর বিধানসভার সদস্য ছিলেন, দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে রাজ্য সরকারকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই দীর্ঘ পর্বে তিনি বিধানসভায় ও রাজ্য সরকারে তাঁর উপস্থিতিকে শ্রমিক, কৃষক, বিদ্যালয় শিক্ষক, কর্মচারী ও সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ সহ জনগণের জন্য লড়াই-সংগ্রাম চালাতে ব্যবহার করেছেন। মানুষের চোখে কমরেড জ্যোতি বসু ছিলেন তাঁদের দাবি ও অধিকার আদায় ও রক্ষার লড়াইয়ের শীর্ষ নেতা। তাঁরা জানতেন, কমরেড জ্যোতি বসু এমন একজন নেতা, যিনি কখনও বুর্জোয়া ও শাসক শ্রেণীর স্বার্থের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন না।

দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির নেতা এশপ পাহাড়ের সঙ্গে।

দানুষই স্পন্দিত বুকে, প্রতিশক্ষ লড়াইয়ের

পিট সিগারকে স্বাগত। কলকাতায়।

দীর্ঘতম রাজনৈতিক জীবনে তিনি সবসময় সময়োপযোগী, এত পুরাতন তবু চিরনতুন এবং বৈজ্ঞানিক অর্থে এত আধুনিক যে উত্তর-আধুনিকতাবাদীদের কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকলে তাঁকে দেখে লজ্জা পেতো। তিনি অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন না কিন্তু সাদামাটা, সোজাসাপটা কথায় সাধারণ মানুষের গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে তিনি অসাধারণ। এরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। মূলকথা হলো এতো অসাধারণ হয়েও তিনি সাধারণের যৌথকর্মধারায় নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। মেনে নিতে না পারলে মুখ খুলতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু শেষপর্যন্ত ব্যক্তি হিসাবে সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন। জ্যোতিবাবু তাই সাধারণকে নিয়েই অসাধারণ।

নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মনমোহন অধিকারীর সঙ্গে।

নেপালের কমিউনিস্ট পার্টির নেত্রী সাহানা প্রধানের সঙ্গে।

মানুষই স্পন্দিত বুকে, প্রতিশব্দ লড়াইয়ের

২০০৮ সালের ৭ই ডিসেম্বর। 'ফুটবলের রাজপুত্র' আর 'কিংবদন্তী জননেতা' মুখোমুখি। দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনা জ্যোতি বসুর বাড়িতে এসে বললেন, 'এই তামাম দুনিয়ায় ফিদেলের যাঁরা বন্ধু, তাঁরা আমারও বন্ধু। আর আপনি হলেন সেই বন্ধুকুলে সর্বজ্যেষ্ঠ'।

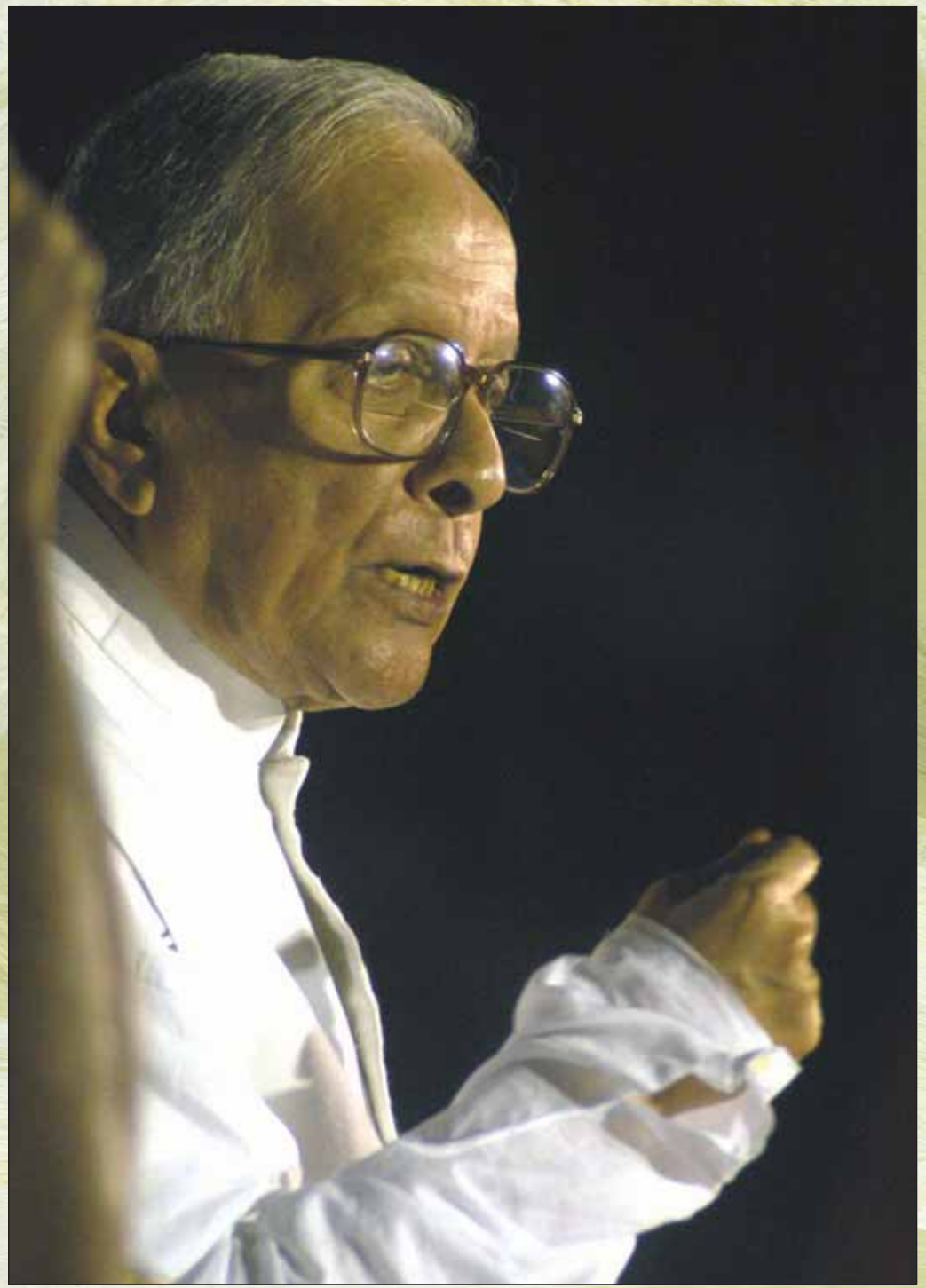

মানুষই ছিলো তাঁর আস্থার উৎস

দিল্লি থেকে গোটা দেশকে চালানো অসম্ভব – এক বছর আগেই মহাকরণ থেকে দিল্লির নর্থ ব্লকে জমা পড়েছে বিকল্প দলিল। দেশজুড়ে আলোচনা। সবাই একমত। এধরনের কেন্দ্রীভবন ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারবে না। এদিকে কংগ্রেসের গভীর বিশ্বাস ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণে। তাতেই না কি শক্তিশালী হবে ভারত। মহাকরণের পালটা দলিল, রাজ্যগুলি শক্তিশালী হলে তবেই শক্তিশালী হবে ভারত। শক্তিশালী কেন্দ্রের জন্য চাই শক্তিশালী রাজ্য। চাই কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস, রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা, অধিক অর্থ। নেতৃত্বে জ্যোতি বসু। অবশেষে দাবি আদায়। সারকারিয়া কমিশন।

এবং তখন থেকেই জ্যোতি বসু সর্বভারতীয় রাজনীতিতে সবচেয়ে শোভনসুন্দর, বিশ্বাসযোগ্য মুখ।

মানুষই স্পন্দিত বুকে, প্রতিশব্দ লড়াইয়ের

রাষ্ট্রপতি শঙ্কর দয়াল শর্মার সঙ্গে। রয়েছেন রাজ্যপাল সৈয়দ নুরুল হাসান।

ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে অনড়। আপসহীন, অকুতোভয় যোদ্ধা। অ-বি জে পি দলগুলি যখনই তাদের ভাষা হারিয়েছে, তখন বসুর উপস্থিতি তাঁদের মুখে দিয়েছে প্রত্যয়ের ভাষা।

মোরারজী দেশাই, চরণ সিং, মধ্যবর্তী নির্বাচন, ফের ক্ষমতায় ইন্দিরা গান্ধী। রাজনৈতিক মতপার্থক্য প্রকট থাকলেও, দু'জনের মধ্যে ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক। রাজীব ছিলেন তাঁর পুত্রসম। বসু তাঁর 'আঙ্কেল'। এদিকে '৭৭-পরবর্তী অনেক কিছুই আন্দোলিত হতে থাকে ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে। সোসালিস্টদের সঙ্গে আঞ্চলিক দলগুলি পেয়েছে বাড়তি শক্তি। জাতীয় রাজনীতিতে নতুন সম্ভাবনা।

আবারও নেতৃত্বে বসু।

দমদম বিমানবন্দর প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে।

১৩-১৫ জানুয়ারি, ১৯৮৪। কলকাতায় কনক্লেভ। অকংগ্রেসী রাজনৈতিক দল ও মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলন। হাজির ১৮টি দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। পাঁচ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। কর্নাটকের রামকৃষ্ণ হেগড়ে থেকে জম্মু কাশ্মীরের ফারুক আবদুল্লাহ। অন্ধ্রপ্রদেশের এন টি রামা রাও থেকে ত্রিপুরার নৃপেন চক্রবর্তী। ব্রিগেডে সমাবেশ।

অকংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রীদের ঐক্যবদ্ধ করার আলোচনা চলছে। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন টি রামা রাও-এর সঙ্গে।

২০০১ সালের ২৫ শে মার্চ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বামফ্রন্টের নির্বাচনী সমাবেশে ভি পি সং ও জ্যোতি বসু।

দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধী, এ আই সি সি'র সাধারণ সম্পাদক রাজীব গান্ধী। অকংগ্রেসী সরকারগুলিকে ভেঙে দেওয়ার চক্রান্ত। প্রতিরোধে জ্যোতি বসুকে কেন্দ্র করে বিরোধী-বৃত্তে আকালি থেকে অসম গণ পরিষদের তরুণ নেতৃত্ব। কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলিতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের দাবিতে এককাট্টা বিরোধীরা। সেবছরের স্বাধীনতা দিবস। ৩৫৬। একতরফাভাবে বরখাস্ত এন টি আর সরকার। বসুর নেতৃত্বে তুমুল আন্দোলন। চাপের মুখে সেবছরই সেপ্টেম্বরে অন্ধ্রপ্রদেশে রাজ্যপাল বদল। ভাস্কর রাওকে সরিয়ে ফের মুখ্যমন্ত্রী এন টি আর। নজিরবিহীন এই ঘটনা দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কাছে ছিল অভূতপূর্ব সাফল্য।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবেগৌড়া দেখা করলেন জ্যোতি বসুর সঙ্গে।

দেশজুড়ে তুঙ্গে বসুর জনপ্রিয়তার পারদ।

এরপর আবার বোফর্স কেলেঙ্কারিকে কেন্দ্র করে দিল্লিতে অকংগ্রেসী সরকার তৈরির জোরালো সম্ভাবনা। বামপন্থীরা, সোসালিস্টরা, আঞ্চলিক দলগুলি – সমস্ত শক্তি একজোট বিকল্প রাজনৈতিক কাঠামোর মঞ্চে। এবং তখনও বৃত্তের ভরকেন্দ্রে বসু।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে এক করার কাজে সামনের সারিতে।

প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে রাজভবনে।

একদিকে এল কে আদবানি বাবরি মসজিদকে নিয়ে অন্ধকারের নকশা আঁকতে ব্যস্ত, অন্যদিকে জাহাজ ডোবাতে মরিয়া চন্দ্রশেখর। বেশিদিন টেকেনি ভি পি'র সরকার। কংগ্রেস আবার ক্ষমতায়। জনতা দল ভেঙে টুকরো-টুকরো। অসুস্থতার কারণে ভি পি প্রায় নিয়ে ফেলেছেন অবসর। সংস্কারের প্রকৃত স্থপতি নরসিমা রাওয়ের বিরুদ্ধে দেশজোড়া প্রবল অসন্তোষ। লক্ষণ স্পষ্ট। ক্ষমতার অলিন্দ থেকে আবারও বিদায় নিতে চলেছে কংগ্রেস।

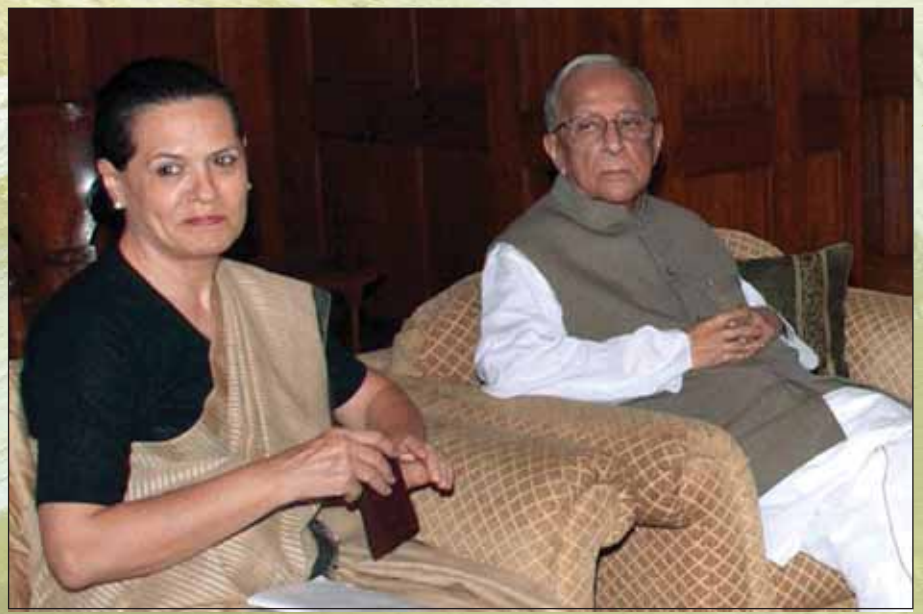

সোনিয়া গান্ধী ও জ্যোতি বসু।

প্রধানমন্ত্রী আই কে গুজরাল ও জ্যোতি বসু। এক অনুষ্ঠানে।

এবং, এই প্রথম ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসে, তৃতীয় শক্তির উত্থান।

মানুষই স্পন্দিত বুকে, প্রতিশব্দ লড়াইয়ের

মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার টি এন শেষন মহাকরণে এলেন দেখা করতে।

১৯৯৬এর নির্বাচন। কেন্দ্রে একটি অকংগ্রেসী, অ-বি জে পি সরকার তৈরির সম্ভাবনা। এসময় ভি পি সিং তৃতীয় ফ্রন্টের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বসুকে আমন্ত্রণ জানান। এবং এটি ছিল নির্বাচনের আগে। নির্বাচনের পর তৈরি হয় একই পরিস্থিতি। বি জে পি একক বৃহত্তম দল। বাজপেয়ীর নেতৃত্ব ১৩দিনের সরকার। সি পি আই (এম), জ্যোতি বসুর উদ্যোগেই সেসময় তৈরি হয় যুক্তফ্রন্ট। জনতা দল, সমাজবাদী পার্টি, তেলগু দেশম, ডি এম কে, তামিল মানিলা কংগ্রেস, অ গ প-সহ আঞ্চলিক দলগুলিকে নিয়ে।

এবার জ্যোতি বসুকে প্রধানমন্ত্রী চেয়ে সর্বসম্মত পছন্দের প্রস্তাব আসে দিল্লিতে সি পি আই (এম) সদর দপ্তরে।

বাজারি মিডিয়ার ভাষায় 'বাস্তববাদী' জ্যোতি বসু (তাঁর নিজের কথায়, 'বাস্তববাদী নই, আমি মার্কসবাদী') অনুগত সৈনিকের মতোই মেনে নেন পার্টির সিদ্ধান্ত।

২০০২ সালের ২১ শে ডিসেম্বর। কে আর নারায়ণনের সঙ্গে।

সেদিন যুক্তফ্রন্টের পক্ষে একার শক্তিতে সরকার গঠন করা সম্ভব ছিল না। বাইরে থেকে কংগ্রেসের সমর্থনের সাহায্যেই কেবল একটি ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গঠন সম্ভব। এই পরিস্থিতিতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়, পার্টি সরকারে যোগ দেবে না। কিন্তু, বাইরে থেকে সরকারকে সমর্থন করবে। এই ভিত্তিতে তৈরি হয় যুক্তফ্রন্ট সরকার। তৈরি হয় একটি স্টিয়ারিং কমিটি। এবং যোগ দেয় সি পি আই (এম)।

১৯৯৫ সালের এপ্রিলে চন্ডীগড়ে। পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী বিয়ন্ত সিং-এর সঙ্গে।

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী করুণানিধির সঙ্গে। চেন্নাইতে এক জনসভায়।

ফারুক আবদুল্লা ও জ্যোতি বসু। ফারুক আবদুল্লা কলকাতায় এলে অবশ্যই সাক্ষাৎ করতেন জ্যোতি বসুর সঙ্গে।

দু'-দু'টি যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর ১৯৯৮এর মার্চে দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচন। বি জে পি'র নেতৃত্বে প্রথম কোয়ালিশন সরকার। ১৩মাসের সরকার। ১৯৯৯এর এপ্রিল। বাজপেয়ী সরকারের পতন। রাষ্ট্রপতি ভবনের আঙিনায় ক্যামেরার সামনে সোনিয়া গান্ধীর দাবি, 'আমাদের রয়েছে ২৭২জন সাংসদ'। পিচ খুঁড়ে দিয়ে অর্জুন সিং ঘোষণা করেন, 'সোনিয়া গান্ধীই হবেন প্রধানমন্ত্রী।' এবং আবার অচলাবস্থা, কারণ অ-বি জে পি দলগুলি সোনিয়াকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অস্বীকার করেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে দায়িত্বপূর্ণ, নির্ভরযোগ্য মহল থেকে আবারও আসে প্রস্তাব, 'কেন নয় জ্যোতি বসু?' কংগ্রেস নেতৃত্বের অনেকের মতেই, তখন দরকার ছিল, একটি সাহসী 'হ্যাঁ', কিন্তু যথারীতি এ আই সি সি'র নীতি নির্ধারকরা 'না' শুনিয়ে দেন।

প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ও প্রনব মুখার্জির সঙ্গে ২০০৪ সালে নয়াদিল্লির বঙ্গভবনে।

কিন্তু, ২০০৪এ এই জ্যোতি বসুই বি জে পি-কে দূরে রাখতে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গড়তে হরকিষাণ সিং সুরজিতের সঙ্গে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। যেকারণে আস্থা ভোটের সময়ে মনমোহন সিংকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলতে হয় জ্যোতি বসুর নাম।

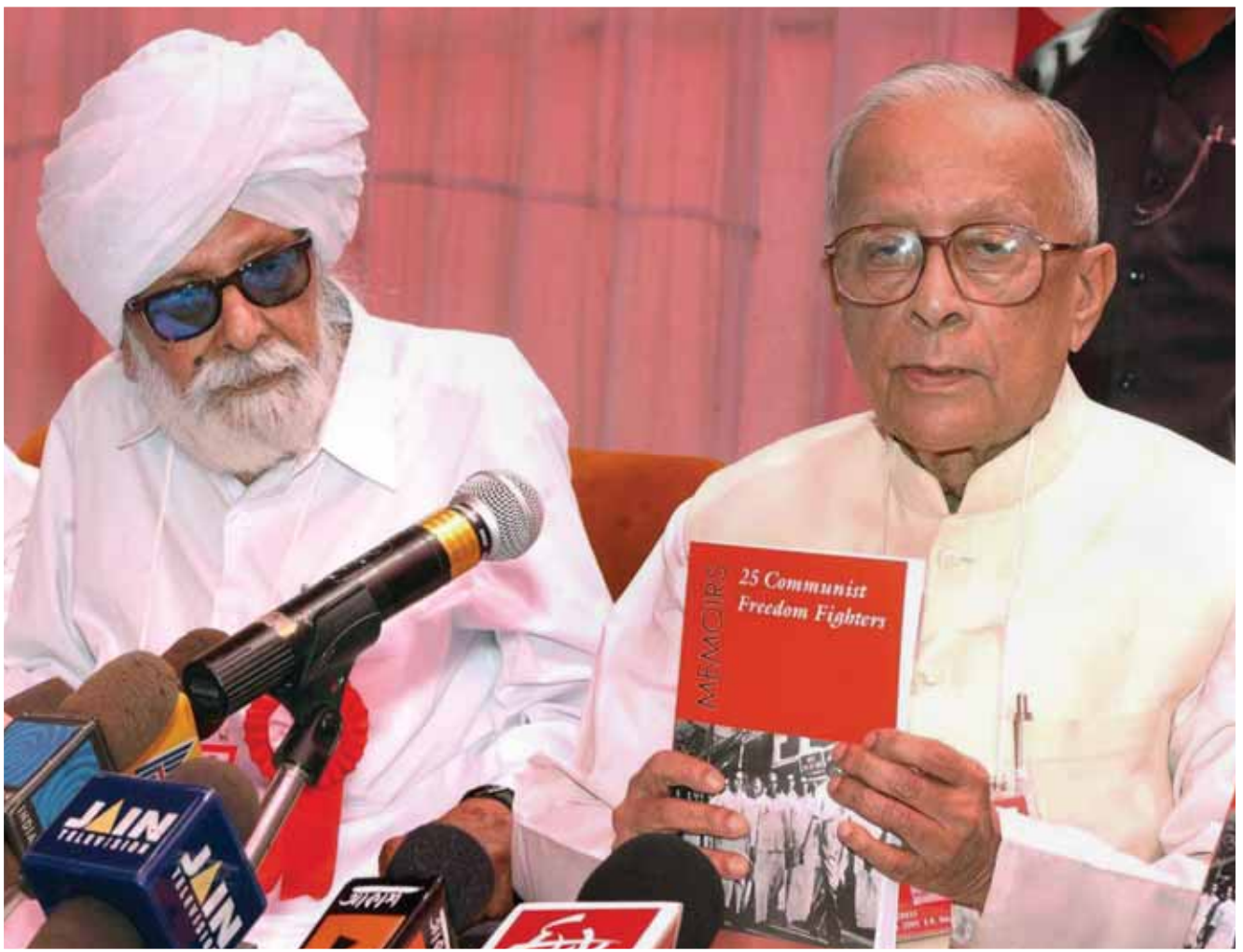

২০০৫ সালের এপ্রিলে সি পি আই(এম)-এর অষ্টাদশ কংগ্রেস উপলক্ষে নয়াদিল্লিতে কমিউনিস্ট স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর একটি বই প্রকাশ করছেন জ্যোতি বসু। রয়েছেন হরিকিষাণ সিং সুরজিৎ।

আদর্শে অবিচল এক প্রবাদপ্রতিম নেতা

২০০৬ সালের ৩রা ডিসেম্বর। সি আই টি ইউ-র ডাকে ব্রিগ্রেডে শ্রমজীবী জনতার মহাসমাবেশে জ্যোতি বসু।

যুগ যুগ ধরে শ্রমিক-কৃষক এবং অন্যান্য খেটে-খাওয়া, পিছিয়ে পড়া মানুষের লড়াই-সংগ্রামে যে স্বপ্নগুলি মূর্ত হয়ে উঠেছিলো বামফ্রন্ট সরকারের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তারা প্রত্যক্ষ করলেন সরকারের যদি সততা ও সদিচ্ছা থাকে তবে সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেবার কাজ অনেকটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

কমরেড জ্যোতি বসু মানে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীর প্রত্যয়ের পরীক্ষা। কমরেড জ্যোতি বসু মানে চা বাগানের আন্দোলনরত স্বদেশীয় মজুর রেলওয়ে শ্রমিকের রুখে দাঁড়ানো। কমরেড জ্যোতি বসু মানে কাজের দাবিতে এগিয়ে চলো দৃপ্ত যুব মিছিল। কমরেড জ্যোতি বসু মানে খাদ্য আন্দোলনের দৃপ্ত জনতা। কমরেড জ্যোতি বসু মানে আধা ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাসের মোকাবিলায় গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ে হার না মানা শহীদের স্মৃতি। ফসলের অধিকার পেতে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন। কমরেড জ্যোতি বসু মানে সাম্রাজ্যবাদী হুকুমদারির বিরুদ্ধে আমাদের ঘাড় সোজা করে এগোনো। কমরেড জ্যোতি বসু মানে সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ আর বিভেদকামিতার বিরুদ্ধে লাগাতার লড়াই।

২০০০ সালের ২৭ শে অক্টোবর। মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তাফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন জ্যোতি বসু। মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলনের পর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে।

সি পি আই(এম)-র অষ্টাদশ কংগ্রেস চলাকালীন পলিট ব্যুরোর বৈঠকে।

এখনো বহু গরিব মানুষ ভুল বুঝে আমাদের সমর্থন করেন না। তাঁরা আমাদের শত্রু নন। তাঁদের কাছে আমাদের পৌঁছতে হবে। এইসব মানুষকে বুঝিয়ে তাঁদের সমর্থনও আমাদের পেতে হবে।

বিমান বসুর সঙ্গে।

তিনি মনে করতেন বেশিরভাগ মানুষের যদি ক্রয়ক্ষমতা না বাড়ে, কৃষির যদি বিকাশ না হয়। বাজার যদি প্রসারিত না হয় তাহলে শিল্পের বিকাশ অসম্ভব। তাই তিনি সেই মূল কাজে প্রথম গুরুত্ব দেন। জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে গ্রামীণ ও কৃষির যে বিকাশ ঘটেছে, শিক্ষার বিকাশের মধ্য দিয়ে যে দক্ষ মানুষ তৈরি হয়েছে, মানুষের যে গণতান্ত্রিক চেতনা ও সামাজিক বোধের বিকাশ ঘটেছে তার সার্বিক ভিত্তির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে আজকের পশ্চিমবঙ্গ।

রাজ্য দপ্তরে। আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে।

বৈঠকের আগে। বিমান বসু এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে।

রাজ্য সম্মেলনের শুরুতে। পতাকা উত্তোলনের পর।

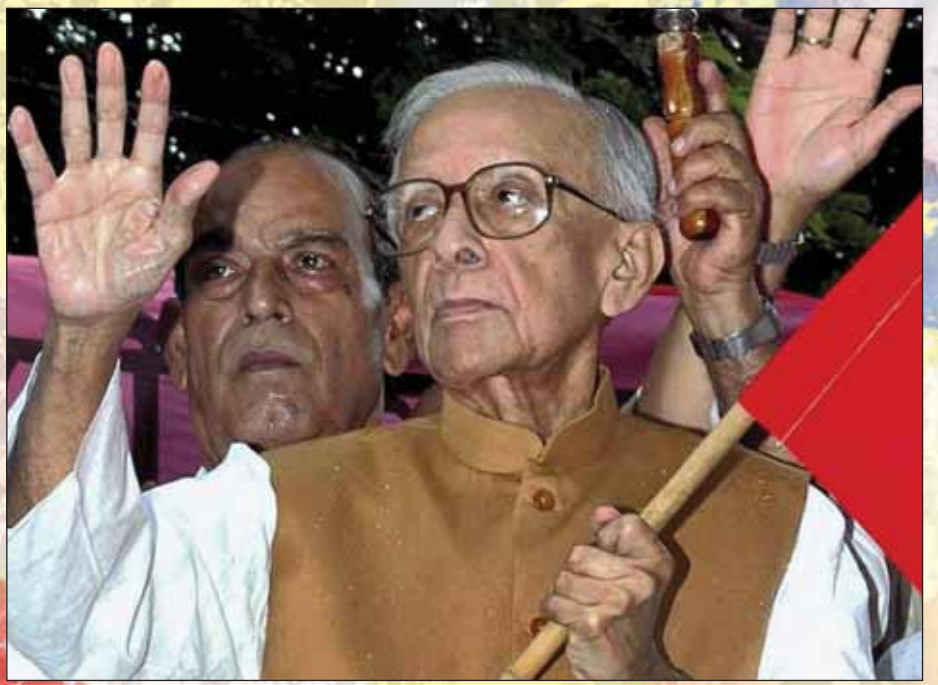

বিশ শতকের চারের দশক থেকে নতুন সহস্রাব্দের প্রথম দশক বিশেষত এ বাংলায় গরিব মেহনতী মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনযুদ্ধ যেন বাঁধা তাঁর স্মৃতির গ্রন্থিতেই।

বাংলার খেটেখাওয়া মানুষের আর্থ-সামাজিক বিকাশের মধ্য দিয়ে এবং গণতান্ত্রিক চেতনা প্রসারের মধ্য দিয়ে আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন নতুন মানুষ গড়ার কাজ শুরু করেছিলো বামফ্রন্ট সরকার।

পার্টি অফিসে।

নতুন পথে নতুনভাবে বাংলাকে গড়ে তোলার কারিগর হিসেবে তাই জ্যোতি বসুর চিরস্থায়ী আসন পাতা হয়ে আছে বাংলার মানুষের হৃদয়ে।

পার্টি কংগ্রেসে। কেরালায়।

দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকলেও বাস্তবে কেন্দ্রই ছিলো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। রাজ্যগুলি থাকতো কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে। জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকারই প্রথম এই ব্যবস্থার মূলে আঘাত করে। শুরু হয় নতুন এক লড়াই। যথার্থ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কেন্দ্র-রাজ্য ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের দাবি ওঠে এরাজ্য থেকেই। জ্যোতি বসুই প্রথম ঘোষণা করেন, রাজ্য যদি শক্তিশালী না হয় দেশ কোনোদিন শক্তিশালী হতে পারে না। জনগণের সবচেয়ে কাছে থাকে রাজ্য সরকার। তাই রাজ্যের কাছে মানুষের প্রত্যাশা বেশি। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে তাই রাজ্যের হাতে চাই অধিক অর্থ ও ক্ষমতা। ১৯৭৭-র অক্টোবরেই বামফ্রন্ট সরকার এ সম্পর্কে দলিল প্রকাশ করে। এই দাবি ও বক্তব্য পরে সারা দেশে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সারকারিয়া কমিশন গঠনের মধ্য দিয়ে তা স্বীকৃতি পায়।

স্বাধীনতার পর শিল্পে এরাজ্য সবার আগে থাকলেও ২৯ বছরের কংগ্রেসী অপশাসনে পেছনের সারিতে চলে যায়। জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার সঙ্কল্প করে রাজ্যের সেই হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনার।

গণশক্তির ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে।

সি আই টি ইউ-র ডাকে ব্রিগ্রেডে শ্রমজীবী জনতার মহাসমাবেশে জ্যোতি বসু।

সি আই টি ইউ-র ক্যাসেট উদ্বোধন অনুষ্ঠানে। রয়েছেন শ্যামল চক্রবর্তী, মহম্মদ আমিন সহ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ।

অমর্ত্য সেনের সঙ্গে।

শাবানা আজমি , জাভেদ আখতারের সঙ্গে।

সংবর্ধনা জ্যোতির্ময়ী শিকদারকে।

সংবর্ধনা সৌরভ গাঙ্গুলীকে।

আপ্ত সহায়ক জয়কৃষ্ণ ঘোষের সঙ্গে।

কাকাবাবুর জন্মদিনে।

সাম্মানিক ডি লিট পাওয়ার পরে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

মানুষই স্পন্দিত বুকে, প্রতিশব্দ লড়াইয়ের

পার্টি কংগ্রেসে।

পলিট ব্যুরোর সদস্যদের সঙ্গে।

জনসভায়।

প্রকাশ কারাতের সঙ্গে।

বামফ্রন্ট সরকারের ৩০বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে।

মানুষই [illegible]দত বুকে, প্রতিশব্দ লড়াইয়ের

উদ্বোধন করছেন নির্বাচনী ওয়েবসাইট। ইন্দিরা ভবনে।

মানুষই স্পন্দিত বুকে, প্রতিশব্দ লড়াইয়ের

> মানুষের স্বার্থ ছাড়া
> কমিউনিস্টদের আর
> কোনো স্বার্থ নেই

বসুকে দেখতে ইন্দিরা ভবনে প্রকাশ কারাত।

জনতার নেতাকে
জনতার সেলাম

জন্মদিন অনুষ্ঠানে। ইন্দিরা ভবনে।

বছর শুরুর দিন শেষ বারের মতো ইন্দিরা ভবন ছেড়ে হাসপাতালে।

শেষ নবরত্নকে উজাড় শ্রদ্ধা পার্টি অফিসে

১৯/১ হৃদয়ে শোক, বুকে শপথ

'গান স্যালুট'-কে ছাপিয়ে গেল **দিনভর** **'রেড স্যালুট'**